KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/7 1/8-10 1/11 1/12	Year of Publication : ফাল্গুন, ১৩৮৬ চৈত্র- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬-৮৭ আষাঢ়, ১৩৮৭ শ্রাবণ, ১৩৮৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী	Remarks : VOL & NO. 1/7 ফাল্গুন, ১৩৮৬ 333 - 340 Page Missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম বর্ষ | পত্রিকা | ফাল্গুন
সপ্তম সংখ্যা | সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র | ১৩৪৬

আইনষ্টাইন ও আপেক্ষিকতাবাদ

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(জড়ের বেগের আপেক্ষিকতা ও আলোকের বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা)

পূর্ব্বের প্রবন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝতে হ'লে গোড়াতেই দু'টি hypothesis বা অনুমানকে, স্বতঃসিদ্ধ না হ'লেও, কতকটা স্বতঃসিদ্ধের মতই স্বীকার করে' নিতে হয়। সে দু'টি হচ্ছে (১) জড়দ্রব্যের বেগ মাত্রই আপেক্ষিক (২) সমবেগের জগতে আলোকের বেগ দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ বা দ্রষ্টার বেগ নিরপেক্ষ। এই অনুমান দু'টির অর্থ কি সার্থকতা কি এবং, সাধারণের নিকট উদ্ভট বলে' মনে হ'লেও ওদের প্রয়োজন হ'ল কেন এ-প্রবন্ধে তার কতকটা আভাস দিতে চেষ্টা করবো। আমরা পরে এও দেখবো যে এই অনুমান দু'টিকে সত্য বলে' মেনে নিলে দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা আপনি এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে জড়ের জড়ত্ব, শক্তির শক্তিমত্তা প্রভৃতিও আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়।

বিজ্ঞানের একটা মস্ত দাবী ও গৌরব এই যে, বিজ্ঞান নামের তোয়াক্কা রাখেনা, পরন্তু মর্য্যাদা দিতে চায়, বিশেষ করে' পরীক্ষালব্ধ সত্যকেই। পরীক্ষালব্ধ ক্ষুদ্র একটি সত্যও নাম-করা বড় বড় থিওরিকে নিমেষে ভূমিসাৎ করে' ফেলেছে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নয়। আপেক্ষিকতাবাদ এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে পরীক্ষাকে ভিত্তি করে' আপেক্ষিকতাবাদের উৎপত্তি সেটি একটি নিষ্ফল পরীক্ষা এবং তা' সম্পন্ন হয়েছিল আমেরিকান বৈজ্ঞানিক মিকল্‌সন কর্ত্তৃক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই নিষ্ফল পরীক্ষার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে গিয়েই আইনষ্টাইন উক্ত অনুমান দু'টিকে গ্রহণ করেন, এবং ওর ওপরেই আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। উক্ত অনুমান দু'টির একটি ঘোষণা করছে আপেক্ষিকতা এবং অপরটি ঘোষণা করছে নিরপেক্ষতার। আপেক্ষিকতা ঘোষণা করছে জড়দ্রব্যের বেগের আর নিরপেক্ষতা ঘোষণা করছে আলোকের বেগের। মিথ্যা ও সত্য হাত ধরাধরি করে' চলেছে, পরস্পরের আওতায় পরস্পরকে ফুটিয়ে তুলছে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। পুরানো বা নিউটনীয় মত জানিয়ে আসছিল জড়দ্রব্যের বেগ আপেক্ষিক বটে কিন্তু নিরপেক্ষও হতে পারে, আইনষ্টাইন্ বল্লেন, "জড়ের নিরপেক্ষ বেগ" কথাটাই অর্থহীন,—সোনার পাথরের বাটির মতো। পুরানো মতে, রামের

মাপে আলোকের বেগ যতটা দাঁড়াবে রামের সম্পর্কে বেগসম্পন্ন শ্যামের মাপে তা দাঁড়াতে পারেনা। আইনষ্টাইনের মতে তা দাঁড়াতেই হবে, নইলে প্রাকৃতিক বিধানের সার্ব্বজনীনত্ব প্রকাণ্ড একটা আঘাত পায়। আলোকের বেগ-মাহাত্ম্য একটা খাঁটী প্রাকৃতিক নিয়ম, তোমার আমার আপেক্ষিক বেগের মতো একটা তুচ্ছ ব্যাপার তাতে বৈষম্য আনতেই পারে না। এইরূপ মত, আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, আমাদের চিরপোষিত সংস্কারের সম্পূর্ণ উল্‌টো। দেশ ও কালকে খাঁটী জিনিষ বলে' আঁকড়ে ধরতে গিয়েই আমরা এতদিন প্রাকৃতিক নিয়মের মাহাত্ম্য ঠিক ধরতে পারি নি। ঐ মাহাত্ম্য স্বীকার করলে দেশ ও কালের পার্থক্য, এমন কি দেশের দেশত্ব ও কালের কালত্ব আপনি লোপ পায়।

বৈজ্ঞানিক মিকলসন্ (এবং পরবর্ত্তী কালে মিকলসন্ ও মরলী) পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ-নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষা, তা' সুসম্পন্নও হয়েছিল এবং চেষ্টাও হয়েছিল বহুবার কিন্তু ধরিত্রী দেবী কি বেগে শূন্যের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন অথবা আদৌ অগ্রসর হয়েছেন কিনা তার কোন কিনারা পাওয়া গেলনা। বলা বাহুল্য, পুরাতন যুগের দেশ ও কালের ধারণা নিয়েই তাঁরা পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন এবং যুক্তি প্রয়োগ করে-ছিলেন। ঐ ধারণাতে যে কোথাও গলদ থাকতে পারে তা' তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন নি, কারণ তা' কেবল পুরাতনত্বের দাবীতেই মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নি, নিউটনের ব্যক্তিত্বও তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেছিল।

মিকলসনের পরীক্ষা প্রণালী স্পষ্ট করে' বুঝতে হ'লে কিছু হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হয় এবং পৃথিবীর (বা কোনও জড়দ্রব্যের) নিরপেক্ষ বেগের অর্থ কি অথবা আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ বেগের মধ্যে পার্থক্য কি সে-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করে' নিতে হয়। আপেক্ষিক বেগের ধারণা এইরূপ: পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্য্য ও অন্যান্য নক্ষত্রগণ পূবে উদয় হয়ে পশ্চিমে চলে' পড়ছে। এবং প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে' পৃথিবীর চার-দিকে পাক খাচ্ছে। নক্ষত্র সমূহের এই যে গতি তাকে বলা যায় ওদের পৃথিবী সম্পর্কীয় আপেক্ষিক গতি। এর স্রষ্টা আমরা এবং আমাদের পরিমাপের ফলে ঐ সকল গতিবেগের যে যে পরিমাণ দাঁড়ায়, আমাদের কাছে ওদের প্রকৃত মূল্যও তাই-ই। অন্যপক্ষে, নক্ষত্রের অধিবাসীরা দেখছে যে পৃথিবী লাটিমের মত পাক খাচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টাতেই একবার করে' ঘুরে আসছে কিন্তু ঘুরছে পশ্চিমের থেকে পুবে। কার কথা, কার পরিমাপ ঠিক? আমরা আমাদের ঘূর্ণনগতি * অনুভব করতে পারছিনে, তা'রা তাদের আকাশপটে গতি অনুভব করতে পারছেনা। আমরা বলতে চাচ্ছি আমরা স্থির ওরা ঘুরছে, ওরা বলতে চাচ্ছে ওরা স্থির আমরা ঘুরছি। প্রত্যেকে তার নিজের জগতে স্থির হয়ে রয়েছে, স্থির বলে ' অনুভব করছে এবং অপরকে গতিবিশিষ্ট দেখছে। কার দেখা ঠিক ?

* নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের মতে, পার্থিব দ্রষ্টার পরীক্ষাতেও পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি ধরা পড়ে। এ-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের শেষের অংশ দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হতে পারে, নক্ষত্রের অধিবাসীরা আমাদের ঘুরতে দেখছে তার প্রমাণ কি ? তারা আছে বা নেই তারই বা প্রমাণ কি? এর সোজাসুজি প্রমাণ অবশ্য নেই, কিন্তু উদাহরণ একটু বদ্‌লে নিলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্যাম দেখছে বোম্বে মেলের আরোহী রাম, ট্রেনের সঙ্গে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে উত্তর দিকে ছুটে চলেছে; অন্যপক্ষে ট্রেনে বসে' রাম দেখছে রাস্তায় দণ্ডায়মান শ্যাম রাস্তার সঙ্গে ঘণ্টায় ঐ ৬০ মাইল বেগেই কিন্তু দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। প্রত্যেকে অপরকে উক্তরূপে বেগবিশিষ্ট দেখছে এবং নিজের জগৎকে—রাম তার ট্রেনরূপ জগৎকে এবং শ্যাম তার রাস্তারূপ জগৎকে—স্থির বলে' অনুভব করছে। কার দেখা, কার পরিমাপ ঠিক? যখন আবার দেখা হ'ল, প্রত্যেকে অপরকে বলছে—"আমি আমার জগতে স্থির ছিলাম কিন্তু তুমি, আমার জগৎ সম্পর্কে, ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছিলে।" এরই নামই বেগের আপেক্ষিকতা। আপেক্ষিক বেগ-সম্পন্ন দু'জন দ্রষ্টার প্রত্যেকে অপরকে ছুটতে দেখে, সমান বেগেই ছুটতে দেখে, কিন্তু এ ওকে ছুটতে দেখে সেদিকে ও একে দেখে ঠিক তার বিপরীত দিকে। যদি দ্রষ্টার চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের এবং তার পরিমাপের কোন মূল্য থাকে তবে বলতে হবে উভয়ের কথাই সম্পূর্ণ ঠিক, অন্ততঃ প্রকৃতিতে এমন বিধান রয়েছে যাতে করে' প্রত্যেকের কথাই ঠিক বলে' মেনে নিতে কোন বাধা হয় না এবং তার জন্য কোনো মুস্‌কিলেও পড়তে হয়না। আপেক্ষিক গতি মানতেই হবে এবং যে কারণে রাম শ্যামের সরল গতি সম্পর্কে মানতে হবে সেই কারণে পৃথিবীর ও নক্ষত্রের ঘূর্ণনগতি সম্পর্কেও মানতে হবে।

নিউটনও মেনেছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জড়দ্রব্যের নিরপেক্ষ গতিও স্বীকার করে-ছিলেন। নিরপেক্ষ গতির কল্পনা এইরূপ: মনে করা যাক, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র কিছুই নেই, শুধু পৃথিবী আছে ও পৃথিবীর উপর আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে আমার সঙ্গে এবং আমার জগতের সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন দ্বিতীয় পদার্থ নেই, সুতরাং আপেক্ষিক গতির কথা ওঠেনা, কিন্তু কোন গতির কথাই ওঠে কি? যদি ওঠে তবে ঐ গতিই হবে আমার অথবা আমার পৃথিবীর নিরপেক্ষ গতি। মিকলসন পৃথিবীর এই ধরণের বেগ মাপতেই অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাঁর ব্যর্থতা, আর কারো না হোক, আইনষ্টাইনের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করতে সক্ষম হয়েছিল যে, ঐরূপ গতি বা ঐরূপ বেগের অস্তিত্বই নেই।

ঐ গতির অর্থ কি?—নিরপেক্ষ গতির অর্থ শূন্যের ভিতর দিয়ে গতি অথবা মহা-শূন্য সম্পর্কে গতি। এখানেও সম্পর্কের কথা বা আপেক্ষিকতার কথা, কিন্তু এই আপেক্ষিক গতিটা কোন জড়দ্রব্য সম্পর্কে নয়, নিছক শূন্য সম্পর্কে,—এমন পদার্থ সম্পর্কে যার কোন গতিই আমরা কল্পনা করতে পারি না, সুতরাং যাকে স্বভাবতঃ স্থির বলে' মেনে নিতেই আমরা বাধ্য। মহাশূন্য চিরস্থির, এর ভিতর বা এর সম্পর্কে যে জড়দ্রব্য স্থির হয়ে রয়েছে তা' প্রকৃতই স্থির এবং তার স্থিতিকে বলা যায় নিরপেক্ষ স্থিতি, আর এর ভিতর দিয়ে, অথবা এর সম্পর্কে, যে জড়দ্রব্য গতিশীল তার গতিকে বলা যায় নিরপেক্ষ গতি এবং

ঐ গতিবেগকে বলা যায় ওর নিরপেক্ষ বেগ।

আপেক্ষিক বা নিরপেক্ষ যে-রূপই কল্পনা করিনা কেন, দেখা যায়, জড়দ্রব্য মাত্রেরই গতি বা স্থিতি অর্থপূর্ণ হয় ওর বাইরের কোন পদার্থের দিকে তাকিয়ে—সে পদার্থটা অপর একটা জড়দ্রব্যই হোক বা নিছক শূন্যই হোক। এই হ'ল পুরানো মত। আইন্‌ষ্টাইন বললেন, ঐ দ্বিতীয় পদার্থটা জড়দ্রব্য হ'লেই স্থিতি বা গতি অর্থপূর্ণ হয়, নিছক শূন্য হ'লে হয় না। অথবা জড়দ্রব্যের গতি বা স্থিতিমাত্রই আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ গতি বা স্থিতি অর্থহীন। এই উক্তির মূলে রয়েছে মিকলসনের নিষ্ফল পরীক্ষা। কি প্রকারে রয়েছে আমরা তাই বলতে যাচ্ছি।

এখন শূন্য সম্পর্কে পৃথিবীর বেগের একটা অর্থ আছে একথা মেনে নিলেও, নিছক শূন্যকে পরিমাণের ভিত্তিভূমি রূপে গ্রহণ করে' পৃথিবীর বেগ মাপবার কল্পনা কোন বৈজ্ঞানিক করেন নি মিকলসনও করেন নি, এবং তার স্পষ্ট কারণ এই যে, মহাশূন্যে কোন খুঁটা গোতা যায় না অথবা অপর কোন প্রকার চিহ্নেও ওকে চিহ্নিত করা যায় না। এই অসহায় অবস্থা হ'তে বৈজ্ঞানিকগণ কতকটা মুক্ত হলেন, অথবা হয়েছি বলে' ভাবলেন যখন আলোক সম্বন্ধে হাইগেনের তরঙ্গবাদ মেনে নিয়ে তাঁরা সমগ্র বিশ্বটাকে 'ইথর' নামক পদার্থ দ্বারা অর্থাৎ তরঙ্গ উঠতে পারে এইরূপ কোন জড়ধর্ম্মী অথচ অতীন্দ্রিয় একটা সাগর দ্বারা কল্পনা বলে পূর্ণ করে' ফেললেন। তখন থেকে ইথর মহাশূন্যের আসন গ্রহণ করল এবং নিরপেক্ষ গতি ও স্থিতির অর্থ হলো ইথর সম্পর্কে গতি ও স্থিতি। সাগরের মত স্থির এবং মহাশূন্যের মত অতীন্দ্রিয় হয়েও ইথর একটা সুবিধার আভাস দিল এই যে,'ওর ভিতরকার আলোক-তরঙ্গকে চিহ্নরূপে অবলম্বন ক'রেই ইথর সম্পর্কে পৃথিবীর বা অপর কোন জড়দ্রব্যের গতিবেগ নিরূপণ করা যেতে পারবে। মিকলসন্‌ও পরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন ঐ সুবিধার ভরসাতেই কিন্তু তাঁর নিষ্ফল পরীক্ষা এটা প্রতিপন্ন করে' দিল যে আলোক-তরঙ্গ, ঐ উদ্দেশ্যে চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হতে মোটেই রাজি নয়। কেন রাজি নয় তার সঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন আইনষ্টাইন,—সে হচ্ছে আলোকের বেগ-মাহাত্ম্য বা আলোক সম্পর্কে প্রাকৃতিক নিয়মের সার্ব্বভৌমিকতা। একথা আমরা পরে বলবো।

এখন আলোক-তরঙ্গ মানলেও ওদের অদৃশ্য বলেই মানতে হবে এবং ওদের কাল্পনিক ঢেউ-তোলা আকার নিয়ে ইথরের ভেতর একস্থানে স্থির হয়ে থাকবার পাত্রও ওরা নয় সুতরাং ওদের চিহ্নরূপে অবলম্বন করে' পৃথিবীর বেগ নিরূপণ সম্ভব হ'লেও সহজসাধ্য নয়। সম্ভব বোধ হয়েছিল এই জন্য যে, পুরাতন মতে ওদের বেগ নিরূপিত হয় ইথরেরই বিশেষ বিশেষ (স্থিতি স্থাপকত্ব, ঘনত্ব বা ঐজাতীয়) ধর্ম্ম দ্বারা সুতরাং আলোকের উৎপত্তিস্থল পৃথিবীই হোক বা অন্য কোন জড়দ্রব্যই হোক এবং তা' ইথরের মধ্যে স্থিরই থাকুক বা ছুটেই চলুক, আলোক-তরঙ্গ বিস্তার লাভ করে (বা আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে) সকল দিকেই সমান বেগে এবং একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে, যদিও সে-বেগ অত্যন্ত ভীষণ, —সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ।

মিকলসনের পরীক্ষার অন্তর্গত যুক্তি এইরূপ। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালুম। অমনি চতুর্দ্দিকে, সহস্র রশ্মির পথে, আলোক-তরঙ্গগুলি ছুটে চল্‌ল। এই বেগ সকল দিকেই সমান এবং তার

পরিমাণও জানা আছে। পৃথিবী ইথরের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে কি কোন দিকে ছুটে চলেছে তার সঙ্গে এই বেগের কোন সম্পর্ক নেই। ইথরের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে, যদি এইরূপ একজন দ্রষ্টার কল্পনা করা যায়, তবে তার মাপে, আলোকের বেগ সকল রশ্মিপথেই সমান হবে। আমার মাপেও সকল দিকে সমান হবে কিনা তা' নির্ভর করে আমি এবং আমার পৃথিবী ইথরের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছি না ছুটে চলেছি তার ওপর। যদি স্থির হয়ে থাকি তবে আমার পরিমাপেও আলোকের বেগ চতুর্দ্দিকেই সমান হবে এবং মেপেও সত্যিই যদি তাই দেখতে পাই তবে আমি সিদ্ধান্ত করবো যে ধরিত্রী বস্তুতঃই ইথরের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছেন, এ-স্থিতি নিরপেক্ষ স্থিতি এবং তার অচলা নাম সার্থক। অন্য পক্ষে, পৃথিবী আমাকে বুকে করে' ইথরের ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে একথা যদি সত্য হয়, তবে আমি যেদিকে যাচ্ছি ঐদিকে, আমার পরিমাপে, আলোকের বেগটা দাঁড়াবে ওর নির্দ্দিষ্ট বেগ (সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ) অপেক্ষা কিছু কম, কারণ আমি ঐদিককার আলোক-তরঙ্গকে পিছন থেকে তাড়া করেছি,—অত সহজে ঐ তরঙ্গকে ছেড়ে চলে' যেতে দিচ্ছিনা। অনুরূপ কারণে, উল্টো দিকে, আমার মাপে, আলোকের বেগটা দাঁড়াবে উক্ত নির্দ্দিষ্ট বেগ অপেক্ষা কিছু বেশী। মোটের উপর পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগটা যদি উত্তর দিকে হয় তবে আমার মাপে আলোকের বেগ, উত্তর দিকে হবে ক্ষুদ্রতম, দক্ষিণ দিকে হবে বৃহত্তম এবং পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে হবে মাঝামাঝি ধরণের। পৃথিবী স্থির থাকলেই আলোকের বেগে, আমার মাপে, কোনরূপ দিক্-বৈষম্য আসবে না কিন্তু বেগবিশিষ্ট হ'লেই একটা দিক্-বৈষম্য আসবে ; এবং যদি আসে তবে আমি সাব্যস্ত করবো পৃথিবী বস্তুতঃই সচলা এবং ছু'টি বিভিন্ন দিকে আলোকের বেগ পরিমাপ করে পৃথিবী কি বেগে কোন্ দিকে ছুটে চলেছে তাও নির্ণয় করতে পারবো। আমরা পূর্ব্বে শূন্যদেশে বা ইথরের ভিতর যে চিহ্নের উল্লেখ করেছি, আলোকের বেগের এই কাল্পনিক দিক-বৈষম্যই সেই চিহ্ন। একে অবলম্বন ক'রেই মিকল্‌সন্ পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিক্‌ভেদে আলোকের বেগে উক্তরূপ বৈষম্যের একটুও ধরা পড়ল না,—যদিও পরীক্ষার বন্দোবস্ত এমনই নির্দ্দোষ ছিল যে বেগের অতি সামান্য পার্থক্যও অনায়াসেই ধরা পড়তে পারত।

মিকল্‌সনের পরীক্ষায় যন্ত্রপাতির বন্দোবস্ত কতকটা পার্শ্বের চিত্রের অনুরূপ। 'ক খ' ও 'ক গ' ছু'টি ঠিক সমান মাপের দণ্ড পরস্পরের আড়ভাবে অবস্থিত এবং 'ক' স্থানে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ। দণ্ড ছুটির অপর প্রান্তে রয়েছে ছু'খানা ছোট আয়না—'খ' ও 'গ'—এবং প্রত্যেকেই 'ক' বিন্দুর দিকে মুখ করে'।

'ক' স্থানে একটা আলো জ্বাললে, আলোক-তরঙ্গগুলি বিভিন্ন রশ্মিপথে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যে সকল তরঙ্গ 'খ' ও 'গ' বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হবে তারা যথাক্রমে 'খ' ও 'গ' আর্শিতে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় 'ক' স্থানেই ফিরে আসবে।

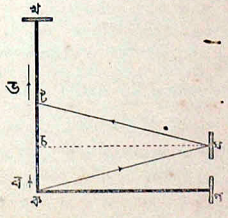

এখন পৃথিবী যদি ইথরের মধ্যে স্থির ভাবে অবস্থান করে তবে তরঙ্গগুলি, ইথরের ভিতর, চতুর্দ্দিকে একই বেগে অগ্রসর হওয়ার ফলে, 'কখ' রেখা ক্রমে ওদের যেতে আসতে যতটা সময় লাগবে 'কগ' রেখায় যেতে আসতেও ঠিক ততটা সময়ই লাগবে। সুতরাং 'ক' স্থানে উভয় পথের তরঙ্গশ্রেণীর মিলন ঘটবে মাথায়-মাথায় ও পেটে-পেটে এবং তার ফলে পাওয়া যাবে অধিকতর জোরালো আলো। কিন্তু পৃথিবী যদি একটা বিশিষ্ট দিকে ছুটে চলে তবে তরঙ্গগুলি একই বেগে চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হ'লেও, পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপে, ওদের বেগে পূর্ব্বোক্ত দিক-বৈষম্য এসে পড়বে। সুতরাং উভয় পথের তরঙ্গশ্রেণীর যখন পুনরায় মিলন ঘটবে তখন পেটে মাথায় মিলন হয়ে বা তরঙ্গে-তরঙ্গে কাটাকাটি হয়ে নিস্তরঙ্গের অবস্থা সৃষ্টি করবার সম্ভাবনা দাঁড়াবে। তা' দেখে বুঝতে পারা যাবে পৃথিবী ইথরের মধ্যে স্থির হয়েই রয়েছে, না কি বেগে কোন দিকে ছুটে চলেছে।

যদি পৃথিবী সচলা হন এবং আলোকের বেগে উক্তরূপ দিক-বৈষম্য দেখা যায় তবে 'কখ' রেখা ক্রমে আলোক-তরঙ্গের যাওয়া-আসার কাল যা' হবে 'কগ' রেখা ক্রমে ঐ কালটা হবে তার তুলনায় কম। এই কাল দুটির সঙ্গে পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগের সম্বন্ধ সহজ হিসাবেই নির্ণয় করা যেতে পারে, সুতরাং ঐ বেগ নিরূপণও সম্ভব হবে।

মনে করে যাক, পৃথিবী ছুটে চলেছে 'কখ' দিক বরাবর এবং 'ব' পরিমিত বেগে এবং ইথরের ভিতর আলোকের নির্দ্দিষ্ট বেগটাকে (যার পরিমাণ আমরা বলেছি সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ) বলা যাক 'ভ'। সুতরাং 'ভ' একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি এবং ওর মূল্য জানা আছে; কিন্তু 'ব'টা অজ্ঞাত রাশি, ওর পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, 'ভ' এর তুলনায় 'ব' অত্যন্ত ছোট হবে। এখন 'কখ' রেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখতে পাই যে, ঐদিকে আলোক-তরঙ্গ ছুটে চলেছে 'ভ' বেগে, আবার 'খ' আরশিখানি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঐদিকে অগ্রসর হচ্ছে 'ব' বেগে; সুতরাং তরঙ্গটা আয়নার কাছে এগোতে পারছে (ভ—ব) বেগে। ফলে 'কখ' দণ্ডের দৈর্ঘ্যকে 'দ' দ্বারা নির্দ্দেশ করলে দেখা যায় যে 'খ' আরশির অভিমুখে তরঙ্গের

$$\text{যাত্রাকাল} = \frac{\text{দ}}{\text{ভ}-\text{ব}}$$

প্রতিফলিত হয়ে ফিরবার সময় তরঙ্গটা দ্রষ্টার অভিমুখে ছুটে আসছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় 'ভ' বেগেই, কিন্তু দ্রষ্টা ওর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে 'ব' বেগে, সুতরাং তরঙ্গটা দ্রষ্টার কাছাকাছি হতে পারছে (ভ+ব) বেগে, ফলে দ্রষ্টার অভিমুখে তরঙ্গের

$$\text{প্রত্যাবর্ত্তন কাল} = \frac{\text{দ}}{\text{ভ}+\text{ব}}$$

সুতরাং যাওয়া-আসার সমগ্র কালটাকে 'স' দ্বারা নির্দ্দেশ করলে, আমরা পাই

$$\text{স} = \frac{\text{দ}}{\text{ভ}-\text{ব}} + \frac{\text{দ}}{\text{ভ}+\text{ব}} = \frac{২\text{দ}\times\text{ভ}}{\text{ভ}^২-\text{ব}^২} \cdots (১)$$

'কখ' রেখায় যাতায়াত কালটা একটু ভিন্ন প্রণালীতে হিসাব করা সুবিধাজনক। 'ক' স্থান হতে যাত্রা করে' 'গ' আরশিতে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় 'ক' বিন্দুতে (বা দ্রষ্টার চোখে) ফিরে আসতে মোট যে সময়টা লাগছে, তার অর্দ্ধেকটা লাগছে যেতে এবং অর্দ্ধেকটা লাগছে ফিরে আসতে, এ সহজেই দেখা যায়। এবারকার যাত্রা কালের হিসাব করলে আমরা দেখতে পাই যে, 'গ' আরশিতে পৌঁছুতে তরঙ্গ বিশেষের যতটা সময় লাগে ততক্ষণে দ্রষ্টা 'ক' স্থান হতে 'চ' এর মত কোন স্থানে এগিয়ে যায় এবং আরশিখানাও ঠিক সমান পরিমাণে এগিয়ে গিয়ে 'গ' স্থান হতে 'ঘ' স্থানে উপস্থিত হয় সুতরাং 'গঘ' রেখা বরাবর যে তরঙ্গগুলি অগ্রসর হয় তারাই ঐ আরশিখানাকে আঘাত করতে সক্ষম হয়। ঐ তরঙ্গগুলি একটু হেলা ভাবেই আরশিকে আঘাত করে এবং আলোকের প্রতিফলনের নিয়মানুসারে, তারা ফিরেও আসে ঠিক ঐ পরিমাণের হেলা পথে বা 'ঘচ' পথে—ঠিক যখন দ্রষ্টা 'কচ' দূরত্বের সমান 'চট' দূরত্ব পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে 'ট' স্থানে উপস্থিত হয়। 'কঘ' ও 'ঘচ' পথের দৈর্ঘ্য সমান, সুতরাং এর যে কোন পথে গতিকাল হিসাব করে' তার দ্বিগুণ করলেই যাওয়া-আসার মোট কালটা পাওয়া যায়। এখন 'কঘচ' ত্রিভুজটা সমকোণী, কারণ 'ঘচ' রেখাটা 'কট' রেখার উপর লম্বভাবে অবস্থিত, সুতরাং জ্যামিতির নিয়মানুসারে

$$\text{কঘ}^২ = \text{কচ}^২ + \text{ঘচ}^২ \cdots (\text{ক})$$

কিন্তু আলোক-তরঙ্গ 'কঘ' রেখা ক্রমে অগ্রসর হয়েছে 'ভ' বেগে সুতরাং ঐ পথের যাত্রাকালকে 'শ' বললে

$$\text{কঘ} = \text{ভ}\times\text{শ}$$

আবার 'শ' সময়ের মধ্যে দ্রষ্টা অগ্রসর হয়েছে 'কচ' পরিমিত পথ এবং এগিয়েছে 'ব' বেগে সুতরাং

$$\text{কচ} = \text{ব}\times\text{শ}$$

'কঘ' এবং 'কচ' দূরত্বের এই মূল্য দু'টি প্রথম সমীকরণে বসিয়ে দিলে এবং 'ঘচ' দূরত্বকে (বা 'কগ' দণ্ডের দৈর্ঘ্যকে) 'দা' দ্বারা নির্দ্দেশ করলে উল্লিখিত (ক) সমীকরণটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করে :

$$\text{ভ}^২ \times \text{শ}^২ = \text{ব}^২ \times \text{শ}^২ + \text{দা}^২$$

$$\text{সুতরাং } \text{শ}^২ \left(\text{ভ}^২ - \text{ব}^২\right) = \text{দা}^২$$

$$\text{অথবা } \text{শ} = \frac{\text{দা}}{\sqrt{\text{ভ}^২-\text{ব}^২}}$$

'শ' প্রতীকটা এখানে শুধু যাত্রাকাল বা শুধু প্রত্যাবর্ত্তনকালের পরিমাণ নির্দ্দেশ করছে। সুতরাং মোট যাওয়া-আসার কালটাকে 'সা' দ্বারা নির্দ্দেশ করলে, আমরা পাই :

$$\text{সা} = \frac{২\ \text{দা}}{\sqrt{\text{ভ}^২-\text{ব}^২}} \cdots\cdots (২)$$

এখন (১) ও (২) নং সমীকরণের প্রথমটাকে দ্বিতীয়টা দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাই

$$\frac{স}{সা}=\frac{দ}{দা}\times\sqrt{\frac{ভ}{ভ^2-ব^2}}=\frac{দ}{দা}\times\frac{১}{\sqrt{১-\frac{ব^2}{ভ^2}}} \quad \cdots\cdots (৩)$$

এই সমীকরণে 'দ' প্রতীকটা 'কখ' দণ্ডের দৈর্ঘ্য এবং 'দা' প্রতীকটা 'কগ' দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করছে এবং এরা, আমরা প্রথমেই বলেছি পরস্পরের সমান হওয়াং—

$$\frac{স}{সা}=\frac{১}{\sqrt{১-\frac{ব^2}{ভ^2}}}$$

'স' ও 'সা' যথাক্রমে 'কখ' ও 'কগ' দণ্ড বরাবর আলোক-তরঙ্গের যাওয়া-আসার কাল নির্দ্দেশ করে। ৪নং সমীকরণ হ'তে এদের মধ্যে সম্বন্ধ পাওয়া গেল। এই সমীকরণ হ'তে দেখা যায় যে, উক্ত কাল দু'টি অসমান এবং 'স'র তুলনায় 'সা' কিঞ্চিৎ ছোট—কারণ ১এর তুলনায় $\sqrt{১-\frac{ব^2}{ভ^2}}$ কিঞ্চিৎ ছোটা ;—কিঞ্চিৎ ছোট, কারণ 'ব' বা পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ 'ভ' বা আলোকের বেগের তুলনায় এক প্রকার নগণ্য বলেই অনুমান করতে হবে। পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ একেবারে শূন্য পরিমিত হলেই, অথবা পৃথিবী একেবারে অচলা হলেই 'স' ও 'সা' পরস্পরের ঠিক সমান হয় এবং উভয় পথের আলোক-তরঙ্গের মাথায় মাথায় ও পেটে পেটে পূর্ণমিলন ঘটবার সম্ভাবনা দাঁড়ায় ; আর পৃথিবী যদি সামান্য বেগেও ইথরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন তবে ঐ কাল দু'টি অসমান হবে এবং উক্ত দু' শ্রেণীর তরঙ্গের আর উক্তরূপ পূর্ণ মিলনের সম্ভাবনা থাকে না।

মিকলসন্ আশাও করেছিলেন তা'ই—উভয় শ্রেণীর তরঙ্গের পূর্ণমিলন ঘটবে না ; আর তাঁর পরীক্ষায় এমন সূক্ষ্ম মাপজোখের ব্যবস্থা ছিল যে পূর্ণমিলন থেকে সামান্য একটু পার্থক্য ঘটলেও তা' অনায়াসে ধরা পড়তে পারত। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ কোন পার্থক্য ধরা পড়ল না। সমগ্র যন্ত্রটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা ক'রেও এবং মাসের পর মাস পরীক্ষা ক'রেও, ফল দাঁড়ালো একই। উভয় দিককার আলোক-তরঙ্গের বেগে কোন পার্থক্য দেখা গেল না, অর্থাৎ ৪নং সমীকরণের 'স' ও 'সা' ঠিক সমান হয়ে দাঁড়ালো,—'া' হবার কথা, যদি ঐ সমীকরণের অন্তর্গত 'ব' রাশিটা ০ বা পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ) শূন্য পরিমিত হয়।

বস্তুতঃ, এই নিষ্ফল পরীক্ষা হতে প্রথমটা এই সিদ্ধান্তই এসে পড়ে যে, ইথর সাগর বা মহাশূন্যে পৃথিবী চিরদিন স্থির হয়েই রয়েছেন এবং এই স্থিতি নিরপেক্ষ স্থিতি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কিছুতে সম্মত হলেন না। হওয়া সম্ভবও নয়, কারণ তাঁদের কল্পনা করতে হচ্ছে যে পৃথিবী, বছরে একবার ক'রে সূর্য্যকে বেষ্টন করে' ঘুরছে। সূর্য্যকে কেন্দ্র করে' পৃথিবী আজ যে বেগে যেদিকে ছুটছে, ছ'মাস পরে, প্রায় তার সমান বেগে তাকে ছুটতে হবে উল্টো দিকে, তবু কল্পনা করতে হবে যে, শূন্য বা ইথর সম্পর্কে পৃথিবী আজও স্থির হয়ে রয়েছে, এবং ছ'মাস পরেও স্থিরই থাকবে। বুঝতে হবে, মিকলসনের পরীক্ষায়, হয় মাপজোখে অথবা তাঁর যুক্তি-প্রণালীতে কোথাও গলদ রয়েছে নিশ্চয়ই।

মাপজোখে কোন ত্রুটী পাওয়া গেল না, সুতরাং গলদ খুঁজবার প্রয়োজন হ'ল যুক্তিতে। যুক্তির মধ্যে রয়েছে পুরাতন যুগের বা নিউটনীয় বিজ্ঞানের দুটি বিশিষ্ট অনুমান : (১) জড়দ্রব্যের বেগ আপেক্ষিকও হতে পারে নিরপেক্ষও হতে পারে যার অর্থ আমরা পূর্ব্বেই বলেছি,—অন্য কোন জড় পদার্থ সম্পর্কেও হতে পারে অথবা নিছক শূন্য সম্পর্কেও হতে পারে। উভয় জাতীয় বেগই অর্থপূর্ণ এবং উভয়ই পরিমাপ যোগ্য। (২) দৈর্ঘ্য এবং কালের পরিমাণ দ্রষ্টার বেগের উপর নির্ভর করে না — দ্রষ্টা দেশের মধ্যে স্থির হয়েই থাকুক তাহলে যে কোন বেগে যে কোন দিকে ছুটেই জড় পদার্থ বিশেষের দৈর্ঘ্য এবং ঘটনা বিশেষের কাল, তার পরিমাপ, উভয়ক্ষেত্রে সমানই হয়ে থাকে।

ফিটজ্‌গারেলড্ এই নিষ্ফল পরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মত প্রকাশ করলেন যে বেগের ফলে পদার্থের দৈর্ঘ্য বদ্‌লে যায়। বললেন, যদিও বেগের দিকের আড়ভাবে (বা লম্বভাবে) অবস্থিত দৈর্ঘ্যটা বদলায় না তথাপি, বেগের দিককার দৈর্ঘ্য, বেগের মাত্রার উপর নির্ভর করে, একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে কমে' যায়। মিকলসনের পরীক্ষার দণ্ড দু'টাকে মেপেজুখে সুরুতে সমান করে' কেটে নিলেও পরস্পরের লম্বভাবে অবস্থিত হওয়ার ফলে তাদের দৈর্ঘ্যের ইতর-বিশেষ ঘটেছে। বেগের আড়ভাবে অবস্থিত 'ক গ' দণ্ডটার দৈর্ঘ্য (দা) বদলায় নি কিন্তু বেগের দিকে অবস্থিত দণ্ডটার দৈর্ঘ্য (দ) একটু ছোট হয়েছে এবং হয়েছে—

$$\frac{দ}{দা}=\sqrt{১-\frac{ব^2}{ভ^2}} \quad \cdots\cdots (৫)$$

এই অনুপাতে। সুতরাং, দ=দা এইরূপ কল্পনা করে' যে ৪নং সমীকরণটা পাওয়া গেছে ওটা ঠিক নয়। ৩নং সমীকরণটাই ঠিক ; 'দ' ও 'দা' অসমান কিন্তু ওদের মধ্যে ৫নং সমীকরণ অনুযায়ী সম্বন্ধটা বর্ত্তমান। এর জন্যই 'স' ও 'সা' (বা উভয় পথে যাওয়া আসার কাল দু'টা) সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মিকলসন্ যে অসমতার আশা করে' পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন তার সন্ধান পাওয়া যায় নি, এবং পাবার সম্ভাবনাও নেই। পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ বা 'ব' শূন্য নহে, সসীম, কিন্তু দৈর্ঘ্যের উক্ত সঙ্কোচন হেতু অনির্ণেয়।

বৈজ্ঞানিকগণ এই সঙ্কোচনকে "ফিটজ্‌গারেলড্ সঙ্কোচন" আখ্যা দিলেন কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যায় অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। জড়দ্রব্য সমূহ তাদের বেগের দিক বরাবর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এই কল্পনাটাই থাপছাড়া বোধ হ'ল। আর সঙ্কোচন ঘটলেও তা ঘটবে। ৫নং সমীকরণ অনুসারে অর্থাৎ কতকটা জড়দ্রব্যের বেগ বা 'ব' এর মুখ তাকিয়ে এবং কতকটা আলোকের নির্দ্দিষ্ট বেগ বা 'ভ' এর মুখ তাকিয়ে, এ ধারণাও অদ্ভুত লাগল। পদার্থের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে আলোকের বেগের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

মহাশূন্যে পৃথিবী স্থির হয়ে রয়েছে কিম্বা ছুটে চলেছে এরূপ প্রশ্ন আসতেই পারে না। আসতে পারে শুধু সূর্য্য সম্পর্কে, নক্ষত্রাদি সম্পর্কে বা অন্যান্য গ্রহাদি সম্পর্কে কি বেগে ছুটে চলেছে এইরূপ প্রশ্নই। পৃথিবীর এই সকল বেগ পার্থিব দ্রষ্টা নিজে মাপতে পারে না, কারণ তার পর্য্যবেক্ষণে

এইটাই সে দেখতে পাচ্ছে যে পৃথিবী তাকে ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছেনা। প্রত্যেক জগতের অধিবাসীর কাছে জগৎ চিরস্থির। তবু সূর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর বেগের একটা অর্থ আছে এবং তা' পরিমাপ যোগ্য। ঐ বেগের অর্থ সূর্য্যের অধিবাসী পরিমাপ করে, পৃথিবীর যে বেগটা দেখতে পায় সেই বেগ। সে বেগ কত এবং কোন দিকে? অবশ্য পৃথিবীর অধিবাসীও তার উত্তর দিতে পারে,—পার্থিব দ্রষ্টার মাপে সূর্য্যের বেগ যা' সূর্য্য সম্পর্কে পৃথিবীর বেগও তাই, কিন্তু উল্টা দিকে।

কিন্তু মিকলসনের পরীক্ষা হতে বড়জোর সমবেগের আপেক্ষিকতার সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। সমবেগ কা'কে বলে? যে বেগে বেগের দিক বা পরিমাণ কোনটারই পরিবর্ত্তন হয় না। মিকলসন ব্যর্থ মনোরথ হয়েছিলেন পৃথিবীর ঐ জাতীয় বেগ নির্ণয়েই। সুতরাং ঐ ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে' বলা যেতে পারে, সমবেগ মাত্রই আপেক্ষিক। বহু পৃথিবী বা বহু জড়খণ্ড কল্পনা করা যেতে পারে যাদের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই দেখছে যে অপরাপর জগৎগুলি সমবেগে ছুটোছুটি করছে। এই সকল জড়খণ্ডকে সমবেগের জগৎ বলা যেতে পারে। আইনষ্টাইন প্রথমতঃ (বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে) প্রচার করলেন যে, সমবেগের জগতে বেগ মাত্রই আপেক্ষিক।

বিষম বেগের অর্থ, দিক বা পরিমাণ অথবা উভয়ই বদলে যাওয়া। ঘূর্ণনগতি এবং বক্রগতি মাত্রই বিষম বেগের উদাহরণ, কারণ এ সকল গতিতে বেগের দিক ক্রমাগত বদলাতে থাকে। পৃথিবীর অভিমুখে পড়ন্ত দ্রব্যের বেগও বিষম বেগ, কারণ এখানে বেগের দিক না বদলালেও ওর পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যায়। সমগতির মত ঘূর্ণনগতি মাত্রই আপেক্ষিক কিনা এ একটা মস্ত প্রশ্ন। অবশ্য, দু'টির বেলায় দু'রকম নিয়ম হবে তা' স্বাভাবিক নয় তবু সহসা একটা সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়। নিউটন দেখিয়েছিলেন যে, ঘূর্ণন ব্যাপারে কেন্দ্রাপসারিণী বলের আবির্ভাব হয় যার ফলে ঘূর্ণ্যমান পদার্থের কণাসমূহ কেন্দ্রের বিপরীত দিকে ছুটে যেতে চায়। এই বলের ক্রিয়া দেখেই ঘূর্ণন বেগের পরিমাণ করা যেতে পারে। পৃথিবী তার অক্ষ রেখাকে বেষ্টন করে' ঘুরছে কিনা অথবা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে কিনা তা' নির্ণয়ের জন্য সূর্য্যের অধিবাসীকে ডাকবার প্রয়োজন নেই, অথবা কল্পনা বলে সূর্য্যে উপস্থিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই; পৃথিবীতেই এবং লেবরেটরির দরজা বন্ধ করেই তা' পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হতে পারে। ফুঁকোর পরীক্ষা এর অন্যতম উদাহরণ।

সুতরাং ঘূর্ণন বেগ মাত্রই আপেক্ষিক একথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আইনষ্টাইন ঘূর্ণনগতির এবং সর্ব্বপ্রকার বিষমগতিরই আপেক্ষিকতা প্রতিপন্ন করেছেন। এজন্য তাঁকে নিউটন কথিত Force বা বলের চিত্রটাকে এবং মাধ্যাকর্ষণ ব্যাপারটাকে নূতন রূপ দিতে হয়েছে, কারণ নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানে, বিষমগতির কারণ রূপে, 'বল' নামক পদার্থের কল্পনা করা হয়েছে।

এখানে আমরা এই কথাটাই বিশেষ করে' বলতে চেয়েছি যে আইনষ্টাইনের মতে বেগ মাত্রই আপেক্ষিক এবং এই কল্পনাকে ভিত্তি করেই তিনি আপেক্ষিকতাবাদের (বিশেষ এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের) প্রকাণ্ড সৌধ গড়ে' তুলেছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, পদার্থ

মাত্রেরই আপেক্ষিকতা প্রতিপাদন আপেক্ষিকতাবাদের আদৌ লক্ষ্যের বিষয় নয়। মিকলসনের পরীক্ষা কেবল জড়ের বেগের আপেক্ষিকতার আভাস দিচ্ছেনা, সঙ্গে সঙ্গে আরও বড় রকমের একটা আভাস দিচ্ছে—সেটা হচ্ছে আলোকের বেগের নিরপেক্ষতা। জড়পদার্থের বেগ আপেক্ষিক হ'লেও আলোক-পদার্থের বেগে রয়েছে নিরপেক্ষতার ছাপ। এইরূপ ছাপের অনুসন্ধানই আপেক্ষিকতাবাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু আলোকের বেগের নিরপেক্ষতা ইথর বা শূন্য সম্পর্কে নয়,—দ্রষ্টা সম্পর্কে। আইনষ্টাইনের মতে আলোকের বেগ, বিভিন্ন দ্রষ্টার পরিমাপে, একই মূল্য জ্ঞাপন করে' থাকে,—ঐ সকল দ্রষ্টা এবং তাদের জগৎ পরস্পর সম্পর্কে স্থিরই থাকুক বা সমবেগ সম্পন্নই হোক তার জন্য ঐ বেগের কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। সমবেগ বলবার তাৎপর্য্য এই যে, মিকলসনের পরীক্ষার নিষ্ফলতা ঐরূপ সিদ্ধান্তেরই অনুমোদন করে। ঐ সকল জগতের দ্রষ্টাগণ স্বাধীনভাবে কোন আলোকরশ্মির বেগ মাপলে দেখতে পাবে যে, ঐ বেগের পরিমাণ সকলের কাছেই সমান—সকলের কাছেই সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশের কাছাকাছি। পুরাতন বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে আইনষ্টাইনের এই অনুমান সৃষ্টিছাড়া রূপেই উপস্থিত হয়েছিল। এর কারণ অতি স্পষ্ট, আমি একটা আলোকরশ্মিকে সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে উত্তর দিকে ছুটে যেতে দেখছি, আবার তোমাকে সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে ঐদিকেই ছুটতে দেখছি, তবু তোমার মাপে ঐ আলোকরশ্মির বেগ, সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল না হয়ে, হবে সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ? আইনষ্টাইনের উত্তর, হাঁ সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশই হবে, মিকলসনের পরীক্ষা এইরূপ hypothesisই অনুমোদন করে।

মিকলসনের পরীক্ষার নিষ্ফলতার ব্যাখ্যা এইরূপ। আমরা কল্পনা করছি মহাশূন্যে পৃথিবী একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে, একটা বিশিষ্ট দিকে—মনে করা যাক উত্তর দিকে—ছুটে চলেছে। এটা কল্পনা মাত্র। পরীক্ষায় পাওয়া যাচ্ছে আলোকের বেগ উত্তর দিকেও যতটা পূর্ব্ব দিকেও ঠিক ততটাই। এটা পরীক্ষলব্ধ সত্য সুতরাং অস্বীকার করবার উপায় নেই। বুঝতে হ'বে, পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপে আলোকের বেগ সকল দিকেই সমান হতে হবে এইরূপই প্রকৃতির বিধান,—উক্তরূপ কল্পনার অনুরোধে ঐ বেগটা উত্তর দিকে একটু বেশী বা দক্ষিণ দিকে একটু কম হতে পারে না। মিকলসনের পরীক্ষায় আলোকের বেগে প্রত্যাশিত দিক-বৈষম্য দেখা যায় নি, কারণ উক্ত কল্পনাটাই ভিত্তিহীন—পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ বলে' কোন বেগের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু পৃথিবীর আপেক্ষিক বেগের স্পষ্ট অর্থ রয়েছে। অন্যান্য গ্রহের অধিবাসিগণ পৃথিবীকে বেগসম্পন্ন দেখছে এবং ঐ বেগের দিক ও পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন বলে' নির্দ্দেশ করছে। তাদের দৃষ্টিতে বা পরিমাপে ভুল নেই কিন্তু ঐরূপ দৃষ্টির অনুরোধেও পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপে আলোকের বেগ বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পরিমাণের হতে পারে না। একথা অন্যান্য জগৎ সম্বন্ধেও খাটে এবং বিশেষ করে, সমবেগের সকল জগতের পক্ষেই খাটে। আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন সমবেগের সকল জগতের পরিমাপেই আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হতে হবে, এ প্রকৃতিরই বিধান। মিকলসনের পরীক্ষার শিক্ষা ইহাই। এই সিদ্ধান্তটাকে আরও ব্যাপকতা দান করে' আইনষ্টাইন নিম্নোক্ত hypothesis প্রচার করলেন:

সমবেগের বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের পরিমাপে, আলোকের বেগের পরিমাণও সমান সমান হতে হবে।

এই উক্তি একটা অনুমান মাত্র হ'লেও খাপছাড়া অনুমান নয় এবং এর গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট; কারণ কেবল আলোকের বেগের নয়, প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্রেরই একটা বড় রকমের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত এই উক্তিকে সার্থকতা দান করছে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি এক একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে—মাপ দ্বারা প্রাপ্ত এইরূপ কতগুলি রাশির মধ্যে সম্বন্ধ। আলোকের বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতাও এইরূপ একটা সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে। নিম্নোক্তরূপে বিচার করলে এ সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। আলোক-রশ্মি আকাশ পথে ছুটে চলেছে। ওর গতি-পথের দুই প্রান্তের অন্তর্গত দূরত্ব মেপে এবং গতি-কাল মেপে আমি পাচ্ছি যথাক্রমে 'দ' ফুট এবং 'স' সেকেণ্ড, কিন্তু আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন ভিন্ন জগতের দ্রষ্টা তুমি পাচ্ছ 'দা' ফুট এবং 'সা' সেকেণ্ড। 'দ' ও 'দা' অথবা 'স' ও 'সা' সমান সমান কিনা সে ভিন্ন কথা কিন্তু আইনষ্টাইনের উক্ত অনুমান মেনে নিলে, অথবা আলোকের বেগের দ্রষ্টা নিরপেক্ষতার দাবি স্বীকার করলে আমরা পাই

$$\frac{দ}{স} = ভ = \frac{দা}{সা} \cdots\cdots\cdots (৬)$$

কারণ উভয় পার্শ্বের অনুপাত দু'টি যথাক্রমে আমার মাপের ও তোমার মাপের আলোকের বেগের পরিমাণ নির্দ্দেশ কচ্ছে এবং উক্ত দাবি অনুসারে উভয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি হতে হবে যাকে উক্ত সমীকরণে 'ভ' প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। 'ভ' এর মূল্য, আমরা জানি সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ।

পুরানো মত গ্রহণ করলে আর আমরা উভয় অনুপাতকে একই রাশির দ্বারা নির্দ্দেশ করতে পারি না, কারণ ঐ মত অনুসারে, আমাদের আপেক্ষিক বেগের জন্য, আলোকের বেগের পরিমাপের ফল আমার পক্ষে 'ভ' পরিমিত হ'লে, তোমার পক্ষে হতে হবে 'ভা'—'ভ' হতে ভিন্ন আর একটা রাশি। বাস্তবিক যদি তাই হ'ত তবে আলোকের বেগ সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়মটা দ্রষ্টা ভেদে বদ্‌লে যেত। আলোকের দ্রষ্টা নিরপেক্ষতার দাবি অথবা ৬নং সমীকরণটা এই ইঙ্গিত কচ্ছে যে দ্রষ্টা-গণের আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, সমবেগের বিভিন্ন জগতে, আলোকের বেগ সম্পর্কীয় প্রাকৃতিক নিয়মটা, সকল দ্রষ্টার পক্ষেই, একই আকার ধারণ করে' থাকে। আইনষ্টাইন আরও বল্লেন, এই দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা কেবল আলোকের বেগ সম্পর্কে নয়, খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মমাত্রেই সাধারণ লক্ষণ অর্থাৎ সমবেগের বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণের পরিমাপের খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্রই একই আকার ধারণ করে' থাকে।

এই উক্তিই, আমরা পূর্ব্বের অধ্যায়ে বলেছি, বিশিষ্ট আপেক্ষিকতাবাদ নামে পরিচিত।

এই আলোচনা হতে আমরা এটাই দেখতে পাচ্ছি যে, আইনষ্টাইনের মতে মিকলসনের পরীক্ষার ব্যর্থতার মূলে রয়েছে পুরাতন যুগের দু'টি ভিত্তিহীন অনুমান। জড়দ্রব্যের নিরপেক্ষ বেগের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং আলোকের বেগের দ্রষ্টা-সাপেক্ষতার সাহায্য গ্রহণ করে' মিকলসন পরীক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অনুমান দু'টি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, এবং উভয়ই ভিত্তিহীন। মিকলসনের পরীক্ষায় নিষ্ফলতার কারণ ইহাই, কিন্তু কি গৌরবগর্ব্বোজ্জ্বল এই নিষ্ফলতা যা' জগদ্দর্শন প্রণালীতে আমাদের দৃষ্টির সীমারেখাকে এমন অসম্ভব পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে!

সহরতলী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— তিন —

যশোদা ভাবিয়াছিল, শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝি চিরকালের জন্যই চুকিয়া গিয়াছে। বহুদিন নিজের বাড়ী ছুটিতে অনেকগুলি ওই শ্রেণীর নরনারীকে আশ্রয় দিয়া, দুবেলা কুড়ি-বাইশ জনের জন্য ভাত রান্না করিয়া, এখানে-ওখানে দু'চারজনের কাজ জুটাইয়া দিয়া, বিপদে আপদে পরামর্শ দিয়া আর সাহায্য করিয়া তার মনে একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ঠিক ওভাবে ছাড়া এসব মানুষের সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। সম্পর্কটা গড়িয়া উঠিয়াছিল আপনা হইতে, স্বাভাবিকভাবে। প্রথমে ওদের কেবল ভাড়াটে হিসাবে যশোদা বাড়ীতে থাকিতে দিয়াছিল মাত্র, ওদের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের ভাবনাটাও যে তাকে একদিন ভাবিতে হইবে কে তখন এ কথাটা কল্পনা করিয়াছিল! চোখের সামনে এই শ্রেণীর জীবগুলির কয়েকজন প্রতিনিধির জীবন-যাপনের প্রক্রিয়া দেখিতে দেখিতে যশোদা টের পাইয়া গিয়াছিল এরা সব বয়স্ক শিশুমাত্র, অনেক-কিছুর অভাবে আর চাপে থানিকটা বিগড়াইয়া গিয়াছে। একটু একটু করিয়া তখন মায়া জাগিয়াছিল যশোদার মধ্যে। একটু একটু করিয়া তারপর সে জড়াইয়া গিয়াছিল ওদের জীবনের সঙ্গে। চাঁদের জন্য সবসময় যশোদার মনটা তখন হু হু করিত, এতগুলি বয়স্ক শিশুকে পাইয়া শোকটা তার কমিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওরা তাকে ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয়ের কারসাজিতে আর তাকে ওরা বিশ্বাস করে না। তাকে শত্রু জানিয়া, তার সংস্পর্শে আসিলে বিপদ ঘটিবে জানিয়া, সকলে তফাতে সরিয়া গিয়াছে। ওদের ভালবাসার ভাণ করিয়া সে উপরওয়ালাদের স্বার্থসাধনের সাহায্য করে, ন্যায্য দাবী ত্যাগ করায়, ধর্ম্মঘট ভাঙিয়া দেয়, কাজ হইতে তাড়ায়। এতকাল পরে যশোদার সম্বন্ধে ওদের এই ধারণা জন্মিয়াছে!

অর্থহীন অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানুষ যশোদা নয়, কোন ব্যাপারকে ব্যক্তিগত কল্পনার বাষ্পে সে ফাঁপাইয়া তোলে না। বাঁচিয়া থাকাটাই যাদের পক্ষে একটা বীভৎস সংগ্রাম, অত কৃতজ্ঞতার ধার ধারিলে কি তাদের চলে? কৃতজ্ঞতাও ওদের যথেষ্টই আছে। কাজ না থাকার সময় দুদিন যাকে যশোদা খাইতে দিয়াছে, কাজ পাওয়ার পরেও যশোদার একটি ধমকে সে যে কাঁদ-কাঁদ হইয়া যাইত, বসিয়া বসিয়া যশোদা দু'দণ্ড সুখদুঃখের গল্প করিলে সকলে যে কৃতার্থ বোধ করিত, তাকি কৃতজ্ঞতা নয়? কিন্তু যখন জানা গেল যশোদা তলে তলে তাদের ক্ষতিই করে, যশোদার বাড়ীতে থাকার জন্যই যখন কাজ যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল, শ্রমিক সমিতি হইতেও যখন উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল যশোদাকে বর্জ্জন করিবার, ওদের তখন আর কি করিবার ছিল?

এসব কথা যে যশোদা ভাবে নাই তা নয়, কিন্তু মনটাই তার বিগড়াইয়া গিয়াছিল। স্বর্ণকে নিয়া উধাও হইয়া গিয়া নন্দ তাকে আরও বেশী কাবু করিয়া দিয়াছে। নিজেকে যশোদার কেমন অপরাধী মনে হয়। মনে আর জোর পায় না। যুক্তিতর্ক দিয়া মনকে বুঝাইয়া মনের জোর তো আর বাড়ানো যায় না।

তাই, কেবল শ্রমিকরা যে তাকে ত্যাগ করিয়াছে তা নয়, সেও একরকম ওদের ত্যাগ করিয়াছে। সত্যপ্রিয় মিলের কেউ না আসুক, অন্য মিলের অনেকে মাঝে মাঝে যশোদার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, কেউ আসিয়াছে বিপদে পড়িয়া, কেউ আসিয়াছে কাজের সন্ধানে, কেউ আসিয়াছে নিছক দু'দণ্ড যশোদার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার জন্য। সকলে যে তাকে ত্যাগ করে নাই তার এতবড় একটা প্রমাণও যশোদাকে কিন্তু খুসী করিতে পারে নাই।

সোজাসুজি কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কি চাই?'

কি চাই অর্দ্ধেকটা শুনিতে না শুনিতে বলিয়াছে, 'আমি পারব না। আমার কাছে এসেছ কেন?'

মনটা যশোদার সত্যই একটু বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তবু মনের কোণে হয়তো যশোদার ক্ষীণ একটু আশা বা ইচ্ছা ছিল, একদিন আবার বাড়ীতে তার কুলি মজুরেরা বাসা বাঁধিবে, আবার সে চুবেলা ওদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। কিন্তু রাজেনের * প্ররোচনায় বাড়ীতে ভদ্র ভাড়াটেদের আনিবার পর সে-আশাও যশোদার ঘুচিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তার বাড়ীর চারিদিকের সহরতলীর, তাতে কুলি-মজুরদের এখানে আর বাস করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। চারিদিকের সহুরে ভদ্র আবহাওয়ার চাপে বেচারাদের দম আটকাইয়া আসিবে, এক মুহূর্ত্তের স্বস্তি থাকিবে না।

কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়া কুলি মজুরদের জীবনের সঙ্গে যশোদার যোগাযোগ ঘটিয়া গেল। রাজেন একদিন মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে আনিয়া হাজির, যশোদার সঙ্গে আলাপ করিবে। কেন আলাপ করিবে, মানুষটার নাম কি, কি করে, কিছুই রাজেন প্রথমে বলিল না। লোকটিও ঘণ্টা-খানেক এ-বিষয়ে সে-বিষয়ে এলোমেলো আলোচনা করিয়া উঠিয়া গেল। আলাপ করিতে যে আসিয়াছে সে শুধু আলাপ করুক যশোদার তাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ কোন্ দেশী আলাপ? একেবারে যেন অনেকদিনের পরিচয় ছিল, খানিকক্ষণ বসিয়া বাজে গল্পের আনন্দ করিয়া চলিয়া গেল। লোকটি বসিয়া থাকিতে থাকিতেই যশোদা কয়েকবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রাজেনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু লোকটি বিদায় হওয়ার আগে তার কাছে একটি কথাও শোনা গেল না।

'আসছি' বলিয়া লোকটির সঙ্গে উঠিয়া গিয়া অনেকক্ষণ পরে রাজেন ফিরিয়া আসিল।

'কেমন লাগলো মানুষটিকে চাঁদের মা?'

*একটু ভুল হইয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ডে কুমুদিনীর স্বামীর নাম ছিল রাজেন, গত কয়েক সংখ্যায় তার নাম কেদার লেখা হইয়াছে। কুমুদিনী যে রকম রাগী আর ঝগড়াটে তাতে এরকম একটা মারাত্মক ভুলের জের টানিয়া চলিবার সাহস হইল না।—লেখক

'তা যেমনি লাগুক, আগে বলত শুনি মানুষটা কে?'

'খুব নাম-করা লোক গো—বিধুবাবু।'

বিধুবাবুর নাম যশোদাও শুনিয়াছে, শ্রমিক নেতা হিসাবে লোকটি সত্যই এতখানি বিখ্যাত যে এভাবে বাড়ী আসিয়া যশোদার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাওয়া সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার।

'বিধুবাবু! বিধুবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন কেন?'

রাজেনের চেয়ে সে-কথা বিধুবাবুই যশোদাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, দিন তিনেক পরে। আবার তেমনিভাবে অসময়ে আসিয়া আলগোছে একটি মোড়াতে বসিয়া বলিল, 'তাহ'লে পর্শুর সভাতে যাচ্ছ তো দিদি?'

আগের দিন বিধুবাবু তাকে 'তুমি'ও বলে নাই, দিদিও বলে নাই। যশোদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কিসের সভা?'

বিধুবাবু আরও বেশী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন, রাজেন বলেনি?'

'কই, না?'

সঙ্গে সঙ্গে বিধুবাবুর হাসির শব্দে যশোদার বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।—'তা রাজেন ওই রকম মানুষই বটে! আমি কে তাতো বলেছে, না তাও বলে নি?'

'প্রথম দিন বলে নি, আপনি যাওয়ার পর বলেছে।' যশোদারও হাসি আসিতেছিল। প্রথমদিন বিধুবাবুর তবে ধারণা ছিল যশোদা তার নাম-ধাম আর দেখা করিতে আসার উদ্দেশ্য সমস্তই জানে, তাই পরিচয়ও দেয় নাই, কাজের কথাও বলে নাই। লোকটিকে যশোদার ভাল লাগিতে থাকে। এরকম লোকই ভাল, যারা অকারণে প্রথম পরিচয়ের দিন অনাবশ্যক ব্যগ্রতার সঙ্গে বড়-বড় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আরও বড় প্রয়োজন যে চেনা হওয়া, তাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বসে না।

পর্শুদিন শ্রমিকদের একটি সভা হইবে, সাধারণ সভা। প্রথমে কর্ম্মীদের সভা, তারপর শ্রমিকদের। বিধুবাবু যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া যাইতে চায়, ব্যাপারটা একটু দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া আসিবে। তারপর যশোদার যদি ইচ্ছা হয়, সমিতির মধ্যে ভিড়িয়া গিয়া একটু কাজ করিতে চায় সে তো আনন্দের কথা। আর ভিড়িতে যদি না চায় নাই ভিড়িবে। একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে দোষ নাই।

'সমিতি-টমিতির সঙ্গে কি আমার বন্‌বে বিধুবাবু? সমিতির লোকেরা আমার ওপোর চটে' আছে, কত কথাই রটিয়েছে আমার নামে।'

'ওসব লোকেশবাবুর কাজ দিদি। লোকেশবাবুর একটু বাড়াবাড়ি আছে কিনা সব বিষয়ে, সমিতির মেম্বার না হয়ে কেউ শ্রমিকদের ভাল করবে তা পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। আগের কথা ভুলে যাও দিদি, তোমাকে আমাদের চাই।'

অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া যশোদা সভায় যাইতে রাজী হইয়া গেল।

বিদায় নেওয়ার আগে বিধুবাবুকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা শুনলেন কার কাছে? রাজেন বলেছে বুঝি?'

বিধুবাবু বলিল, 'সত্যপ্রিয় মিলের কাণ্ডটার সময় আমি ছিলাম পশ্চিমে। এসে অনেক রকম কথা শুনলাম। তোমার কথা তো আগে থেকে সব জানতাম দিদি, তাই শুনে মনে হ'ল, এ তো বড় খাপছাড়া ব্যাপার হচ্ছে। তারপর রাজেন একদিন আমায় বলে কি, বসে' বসে' মরচে ধরায় বড় নাকি কষ্ট পাচ্ছ। আমারও একটু দরকার ছিল, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। সত্যপ্রিয় মিল বড় করেছে জানো?'

'শুনেছি।'

বিধুবাবু খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যশোদার মুখের ভাব দেখিতে থাকে। বড় ধারালো দৃষ্টি বিধুবাবুর, দেখিলেই বুঝা যায় মানুষটা সে ভয়ানক নিষ্ঠুর। তবে এটুকু যশোদা আগেই বুঝিয়াছিল, অন্যকে কষ্ট দিয়া আনন্দ পাওয়ার নিষ্ঠুরতা এটা নয়, এ নিষ্ঠুরতা জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া, যে প্রতিক্রিয়ায় মনের কোমলতা আর ভাবপ্রবণতা গোড়া শুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া যায়। সাধারণ আলাপেই এটা বেশ বোধগম্য হয়। তাছাড়া, যে ভাবে বিধুবাবু হাসে তার মধ্যেও তার মনের এ পরিণতির হদিস স্পষ্টই পাওয়া যায়। এ রকম হাসির সঙ্গে যশোদার পরিচয় আছে, তার পরিচিত আরেক জন লোক এভাবে হাসিত। সমস্ত ব্যাপারে যারা কৌতুক বোধ করে, মর্ম্মান্তিক বেদনায় কাঁদিবার সময় কেউ খাপছাড়া মুখের ভঙ্গি করিলে দেখিয়া যাদের হাসি পায়, কেবল তারাই এ রকম হাসি হাসিতে পারে।

এরকম লোককে কিন্তু এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করা যায়। এদের আর যাই থাক, কিছুমাত্র স্বার্থপরতা থাকে না। পরের জন্য বেশী মন না কাঁদুক, নিজের ভাবনাটা এরা একেবারেই ভাবে না।

সেদিন খাওয়ার সময় সুব্রতা বলিল, 'আমরাও আজ এক যাগায় যাচ্ছি দিদি।'

অজিত তাকে আজ সিনেমায় নিয়া যাইবে। খবরটা দেওয়ার সময় সুব্রতা মুচকি মুচকি হাসে। যশোদাও হাসে।

'আমায় নিয়ে যাবে না?'

'তুমি না কোথায় যাচ্ছ আজকে?'

'ও, তাই জন্যে আজ তোমরা সিনেমায় যাচ্ছ, আমায় ফাঁকি দেবার জন্য!'

বলিয়া প্রচণ্ড শব্দে যশোদা হাসিতে থাকে। এই সামান্য পরিহাসে এত জোরে হাসিবার কি ছিল সেই জানে, হাসিটা বিধুবাবুর মত হইতেছে খেয়াল করিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া যায়।

তারপর সুব্রতা যে খবরটা দেয় সেটা একটু মারাত্মক। একজনের গাড়ীতে তারা সিনেমায় যাইবে, এদিকেই কোথায় সত্যপ্রিয় বলিয়া কে একজন মস্ত বড়লোক থাকে না, তার ছেলের গাড়ীতে। কবে যেন অজিত তার সঙ্গে কোন্ স্কুলে পড়িয়াছিল, হঠাৎ ক'দিন আগে দেখা হইয়া গিয়াছে। তারপর তাদের পরামর্শ হইয়াছে পরস্পরের বৌকে নিয়া আজ তারা একসঙ্গে সিনেমায় যাইবে, আলাপ পরিচয়ও হইবে, একটু আনন্দও করা হইবে। পাকা গিন্নীর মত মুখ করিয়া সুব্রতা বলিতে থাকে, 'আমার কি আর সিনেমা-টিনেমায় যাওয়ার সখ আছে দিদি? কি করব, বন্ধু বড়

ধরেছে। ও কি বলছিল জানো দিদি? বন্ধুর বাপ নাকি বৌকে নিয়ে ছেলের কোথাও যাওয়া দু'চোখে দেখতে পারে না, ভীষণ চটে' যায়। সেকেলে ভূত আর কি। বাপ নাকি কোথায় গিয়েছে ক'দিনের জন্য, ছেলেও বৌকে নিয়ে খুব বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

মহীতোষকে যশোদা জানে, ছেলেটার বুদ্ধি একটু কাঁচা। সকলে তাকে সেকেলে, গেঁয়ো আর অসভ্য মনে করে ভাবিয়া বড়ই মনের কষ্টে সে দিন কাটায়। বাহিরের লোকের সঙ্গে কথায় ব্যবহারে সে বিনয়ের অবতার, যশোদার সঙ্গে পর্য্যন্ত এমন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কথা বলে যে দেখিলে হাসিও পায় মমতাও হয়, রাতে ঘুমের মধ্যেও হয়তো বাপের ভয়ে চমকিয়া জাগিয়া ওঠে, কিন্তু বাড়ীতে যারা আশ্রিত ও আশ্রিতা, আফিসে ও কারখানায় যারা জীবিকার প্রত্যাশী তাদের সঙ্গে তার ব্যবহার বড় খারাপ। কথায় কথায় কারণে অকারণে রাগিয়া যায়, গালাগালি দেয়, অপমান করে। অজিতের সঙ্গে মহীতোষের বন্ধুত্ব না হয় আছে, কিন্তু মহীতোষ কি জানে না বন্ধু তার যশোদার বাড়ীতে থাকে?

শ্রমিক সমিতির সভায় গিয়া যশোদা যে বিশেষ খুসী হইল তা বলা যায় না, তবে তেমন খারাপও তার লাগিল না। সভ্যদের আলোচনা সভায় বড় বেশী তর্ক চলে, নিজের নিজের মতামতটা জাহির করিবার জন্য অনেকে বড় ব্যস্ত। বড় বড় কথাও অনেক বলা হয়, একেবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে, অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনা যেন বক্তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে সকলে এরকম নয়, শান্ত ও সংযত মানুষও কয়েকজন আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই যারা কথা বলে। কিন্তু এদেরও আসল বক্তব্যটা যশোদা আগাগোড়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ হয়তো কথাগুলি জলের মত পরিষ্কার বুঝা যাইতে লাগিল তারপর হঠাৎ কখন কি ভাবে যে সমস্ত বিষয়টা জটিল আর দুর্ব্বোধ্য হইয়া গেল কিছুই যশোদার মাথায় ঢুকিল না। তবে সেজন্য এদের সে দোষ দিল না, অপরাধটা ধরিয়া নিল নিজের বুদ্ধির। কিন্তু শ্রমিকসভার বক্তৃতাগুলি যশোদার ভাল লাগিল না। প্রত্যেকটি বক্তাই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসই শুধু বিতরণ করিয়া গেল, কোন বিষয়েই একটু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা দেখা গেল না। বক্তৃতাগুলি জোরালো হইল সন্দেহ নাই, শ্রমিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাবও দেখা গেল বক্তৃতার, কিন্তু এরকম প্রভাব কি স্থায়ী হয়? কাজে লাগে?

হয়তো লাগে। যা ওদের করা উচিত সেটা কেন করা উচিত বুঝাইয়া দেওয়ার বদলে এমনি বক্তৃতার সাহায্যে করাইয়া নেওয়াই সহজ ও সম্ভব?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত প্রায় নটার সময় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া যশোদার চোখে পড়িল, তাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে সত্যপ্রিয়ের প্রকাণ্ড গাড়ী। ভিতরে শুধু বর্ষিয়সী আছে একটি অল্পবয়সী বৌ। পাশ কাটাইয়া যশোদা গলির মধ্যে ঢুকিতে যাইতেছিল, বৌটি ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'চাঁদের মা, ও চাঁদের মা, শুনুন।'

বৌটি কে এবং এখানে গাড়ীর মধ্যে একা কেন বসিয়া আছে যশোদা আগেই খানিকটা অনুমান করিয়াছিল। কাছে আসিতে মহীতোষের বৌ বলিল, 'ওকে একটু শীগগির পাঠিয়ে দেবেন চাঁদের মা?'

'তা দিচ্ছি, কিন্তু তোমায় একা বসিয়ে রেখে কি বলে' নেমে গেল বাছা?'

'কথা কইতে কইতে এগিয়ে গেছেন।'

বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া মহীতোষ, অজিত আর সুব্রতার মধ্যে তখনো কথা চলিতেছিল। অজিত বা সুব্রতা যে মহীতোষকে আটকাইয়া রাখে নাই, মহীতোষ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে বলিয়াই দুজনে তারা ভিতরে যাইতে পারিতেছে না বুঝিতে যশোদার দেরী হইল না। ছেলেমানুষ তিনজনেই এবং মহীতোষের বুদ্ধিটা সত্যই একটু কাঁচা। সুব্রতাই বা কি, এদিকে তো মুখে তার কথা ছোটে তুবড়ীর মত, ভদ্রতা বজায় রাখিয়াই একটু ইঙ্গিতেও কি মহীতোষের মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না, গলির মোড়ে বৌটাকে সে একা ফেলিয়া আসিয়াছে?

যশোদাকে দেখিয়া মহীতোষ বলিল, 'কেমন আছেন চাঁদের মা? আজ এঁদের নিয়ে—'

'একা বসে' থাকতে বৌমার ভয় করছে।'

'অাঁ? ও, হ্যাঁ, যাই।'

বাড়ীর ভিতরে গিয়া যে যার ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেল। ধনঞ্জয় যশোদার বিছানা দখল করিয়া শুইয়া আছে।

'তুমি এখানে যে?'

ধনঞ্জয় জবাব দিল না।

'ভাত খেয়েছ!'

'খেয়েছি।'

সারাদিন রাগে গজ গজ করিতে করিতে কুমুদিনী আজ এখানে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া গিয়াছে। কথা ছিল, কুমুদিনীর ননদ আসিয়া রাঁধিয়া দিবে, কিন্তু শত্রুর বাড়ীতে নিজে রাঁধিয়া দিতে না আসিলে কুমুদিনীর বোধ হয় তৃপ্তি হয় না। বাহিরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া যশোদা তিনজনের ভাত বাড়িল, তারপর ধনঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিল, 'এখানে এসো না আমাদের খাওয়া দেখবে আর গল্প শুনবে কোথায় গিছলাম?'

ধনঞ্জয় সাড়া দিল না বটে কিন্তু খানিকক্ষণ পরে মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া আসিল। সকলে তখন খাইতে বসিয়াছে। কাঠের পা ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া গেল। সুব্রতা বলিল, 'ওকে ঠক্ ঠক্ করে' হাঁটতে শুনলে এমন লাগে আমার! কি হ'ল দিদি তোমার ওখানে?'

'কি আর হবে, কুলিমজুরের মিটিং। তোমরা কেমন বায়স্কোপ দেখলে বল।'

বায়স্কোপের চেয়ে মহীতোষ আর তার বৌ-এর সঙ্গে পরিচয়ের কাহিনী বলিতে আর দুজনের সমালোচনা করিতেই খাওয়া শেষ হইয়া গেল। একবার মুখ খুলিলে সুব্রতা আর থামিতে পারে না। অাঁচাইয়া উঠিয়া ছবির গল্প আরম্ভ করিয়া বলিল, 'দেখবে দিদি বইটা? নাম-টাম আছে, অনেকের ছবিও আছে।'

বাংলা চলচ্চিত্র। সুব্রতার কথা শুনিতে শুনিতে যশোদা ছাপানো প্রোগ্রামটির পাতা উল্টাইতেছিল। এক পাতায় দুজন অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি দেখিয়া তার চোখের পলক বন্ধ হইয়া গেল। নন্দ আর সুবর্ণ সিনেমায় অভিনয় করিতেছে?

সুব্রতা বলিল, 'কি হ'ল দিদি? কার ফটো দেখছ?—ওঃ, ওই ছেলেটার! এমন সুন্দর গান করলে দিদি ছেলেটা কি বলব তোমায়!'

ক্রমশঃ

তিনি

গোপীনাথ রায়

শহরের এই দিকটা বেশ ফাঁকা। নির্জন, নিরিবিলি। গা-এলানো উদার বিশ্রাম। চোখ জুড়োয়, মন জুড়োয়, শরীর জুড়োয়। জনতার ঠাসাঠাসি নেই, নেই বাড়ী-ঘরের ঠাসবুনোনি। ফাঁকা আকাশ নেমে এসেছে মৃত্তিকায়।

বেছে-গুছেই এই দিকটাতে তিনি বাড়ি কোরেছিলেন, নিজে প্ল্যান তৈরী কোরে কন্ট্র্যাক্টরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেন না, তিনি জান্‌তেন, যেখানে চিরজীবন থাক্‌তে হবে সেটি মনের মতো হওয়া চাই। তা' না-হোলেই তো যন্ত্রণা! ভাড়াটে বাড়ি নয় যে হুট্ বোল্‌তে ছেড়ে চোলে যাবেন।

নির্জনতার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো তাঁর। সেটা তাঁর অন্তরের তাগিদ। নির্জন জীবন তিনি চেয়েছিলেন,—যেন নির্জন হওয়া ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোনো কামনা ছিলো না। তা তিনি পেলেন: কিন্তু, তাতে তিনি সায় দিতে পারলেন না,—মনে-প্রাণে গ্রহণ করা তো দূরে থাক। এতো বড়ো বাড়িতে তিনি প্রেতের মতো একা ঘুরে' বেড়াচ্ছেন, একা বাস কোর্‌ছেন—যতো-কিছু নির্জনতা আর নিঃসংগতা নিয়ে। ঘাসের চটির ভিতরে ছোটো ছোটো পা গলিয়ে দিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন, টুকটাক্ কাজ কোরছেন। এই তিনি ঘরে সোফায় বসে' আছেন, পরক্ষণেই তাঁকে দেখছি বাগানে। এই তো তিনি রান্নার তদারক কোর্‌ছিলেন, ছাদে আবার কখন এলেন? কখনো দিচ্ছেন টবে জল, ফ্লাওয়ার ভ্যাসে কখনো গুঁজে রাখছেন রজনীগন্ধার ডাঁটা, কখনো বা ঘষা-মাজা কোর্‌ছেন। তারপর আছে দুপুর।

সমারোহ বলুন, প্রাচুর্য বলুন, তাঁর জীবনে কখনো, কোনদিনই ছিলো না। চিরট তিনি নিঃশেষ হোতে-হোতে এখন দগ্ধাবশিষ্ট মোমের বাতির মতো। পল্‌তেটা পুড়্‌ছে, মোম গেছে গলে'। বাইশ বছর আগের ইতিহাস তিনি ইচ্ছে কোরেই ভুলে যেতে চান। চেষ্টা করেন—কোনো দুর্বল মুহূর্তে তারা যেন তাঁর মনে হানা দিতে না পারে। একদিন যে তিনি 'ছিলেন'—তা' আজ স্মৃতি হোয়েই থাক্। কিন্তু, কোনো রাত্রে, যে-রাত্রে আকাশে জলে চাঁদ, তাঁর শয্যার উপর জলে মুঠো-মুঠো কাঁচা জ্যোৎস্না, স্মৃতির কাঁটাগুলো তাঁর হৃদয়ে ক্ষত হোয়ে দেখা দেয়। তখন আর তাঁকে মানুষ বলে' চেনা যায় না। মনে হয় কোনো ব্যর্থ প্রেতিনী। অনেক বর্ষার রাতে তিনি উদাস হোয়ে গেছেন, তাঁর চঞ্চল মন কতো বার, কতো ভাবে স্মৃতির এলোমেলো সড়কগুলিকে প্রদক্ষিণ কোরেছে। তারপর তিনি বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠেছেন। তাঁর কান্না শোনার কেউ থাকে নি।

আজ এই চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চোল্‌ছেন। কোনো রকমে জীবনের সীমান্তে পৌছুতে পারলেই যেন তিনি বেঁচে যান।

সংসারের খুঁটিনাটি তাঁকে কাটতে পারে নি। কেন না, অর্থের অভাব তাঁর কোনো কালেই হয় নি। এখনো তিনি অনায়াসে রাশি-রাশি খরচ কোরতে পারেন। তা' তিনি করেন না। কেন করেন না ? কে আছে তাঁর, কার জন্য এতো সঞ্চয় ? কেউ তো নেই! জীবনের বাঁধা-সড়কে যতোদূর দৃষ্টি চলে, এক চিল্‌তে পরিচিত মুখ তো তাঁর নজরে পড়ে না। শুধু আছেন তিনি, কালের প্রহরীর মতো আছেন তাঁর চুয়াল্লিশটি বছর নিয়ে।

তাঁর বাড়িতে তখন সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। ঝাপ্‌সা অন্ধকার। বারান্দায় ইজিচেয়ারের উপর তিনি শুয়ে আছেন। ক্লান্তির ভারে তাঁর সমস্ত শরীর ভেঙে পড়্‌ছে। চোখ বুজে তিনি তাঁর বিগত জীবনে চলা-ফেরা কোর্‌ছেন। হঠাৎ কা'র পা-এর শব্দ তাঁর কানে এলো। চোখ না খুলেই তিনি বোল্‌লেন, 'কে রে, তিনকড়ি ? এতোক্ষণে আলো জ্বালার ফুরসৎ হোলো তোর ?'

অন্ধকার কথা কয়ে উঠ্‌লো : 'কেমন আছো, ঊর্মিলা ?'

ঊর্মিলা ! তীরের মতো এসে কথাটা লাগ্‌লো তাঁর বুকে। তিনি চোখ তুলে তাকালেন। কে ডাক্‌লে ? কে ডাক্‌লে তাঁর নাম ধরে ? তিনি ভয় পেলেন, অথচ, এ স্বর যেন তাঁর অপরিচিত নয়। তিনি উঠে সুইচ্‌টা টেনে দিলেন। নীল আলোয় প্রায়-বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি অস্ফুট আর্তনাদ কোরে উঠ্‌লেন, 'তুমি !'

'হ্যাঁ, আমি-ই।' ভদ্রলোক হাসলেন: 'ধন্যবাদ তোমাকে, যে শেষ পর্যন্ত চিন্‌তে পেরেছো! না পার্‌লেও তোমাকে দোষ দিতে পার্‌তাম না। কিন্তু সে-কথা যাক্‌। কেমন আছো ?'

তিনি তাঁর কথার প্রতিধ্বনি কোর্‌লেন : 'কেমন আছো ? কিন্তু, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা কইবে না-কি ! বস্‌বে না ?'

ভদ্রলোক হেসে উঠ্‌লেন, 'বসেই তো রয়েছি এই ক'টা বছর। দাঁড়াতে আর পারি কই, বাতের যন্ত্রণায় কাহিল কোরে দিয়েছে, ঊর্মিলা।'

পাশের ঘর থেকে চাকরে চেয়ার এনে দিলে তিনি বোস্‌লেন।

'শেষ পর্যন্ত তোমাকেও বাতে ধর্‌লো !'

'ধর্‌বে না! বলো কি, বয়েস কি আর কম হোলো? পঞ্চাশ পার হয়েছে। এখন না হোলে আর হবে কবে ? বয়েস হোলে তোমাকেও ধর্‌বে, দেখে নিয়ো।'

'রক্ষে করো! এক ব্লাড্‌ প্রেসারের জ্বালাতেই অস্থির।' তিনি হাস্‌লেন। আশ্চর্য, আজ বাইশ বছর পর তিনি হাস্‌লেন। কিন্তু, তাঁর হাসিতে প্রাণ নেই, তা কান্নার নামান্তর। তিনি আবার বোল্‌লেন : 'বাইশ বছর, ঠিক বাইশ বছর পর তুমি এলে, দেবব্রত।'

'বাইশ বছর ? দাঁড়াও, দাঁড়াও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাইশ বছরই হবে। ১২৯৬ সাল,—আমার হুবহু মনে আছে।' একটু থেমে দেবব্রত বোল্‌লেন : 'তোমার সঙ্গে যে আর কখনো দ্যাখা হবে, এমন আশা ছিলো না। যদি না সেদিন টেলিফোন ডিরেক্টরী ঘাঁট্‌তে-ঘাঁট্‌তে তোমার ঠিকানা পেতুম, তাহ'লে—'

'কি তাহ'লে ?'

'মনে করতুম্‌ তুমি বুঝি মরে' গেছো !'

'শুধু মনে কোরতে ? কিন্তু আমি তো অনেক দিন মরে' গেছি দেবব্রত, যেটা দেখ্‌ছো, এটা বাইরের খোলস। বলো, মরিনি ?'

দেবব্রত কোনো কথা বোল্‌লেন না।

তিনি বোলে চল্‌লেন : তোমারও অনেক পরিবর্তন হোয়েছে দেবব্রত। তোমার চুল পেকেছে, তোমাকে আজ আর চিন্‌তে পারিনে, কষ্ট হয়।

'কিন্তু, তুমিও তো কম বদ্‌লাওনি, ঊর্মিলা। বাইশ বছর আগে তুমি কি এক জায়গায় চুপ কোরে ঠায় বসে' থাক্‌তে ? ঘুরে বেড়িয়েছো, এ-ঘর থেকে সে-ঘর ; গান গেয়েছো, ঝগড়া কোরেছো, হাস্‌তে-হাস্‌তে ভেঙে পড়েছো। দ্যাখো, আমি কিছুই ভুলিনি। তোমার সঙ্গে যেদিন শেষ দ্যাখা, সেদিন তুমি কোন্‌ রঙেরশাড়ি পরেছিলে, আমি ঠিক ঠিক তা বোলে দিতে পারি। কিন্তু, আজ এমনটা তোমায় দেখ্‌বো, আমি আশা করিনি।'

'কী আশা কোরেছিলে তবে? আমি ঘুরে-ঘুরে বেড়াবো, এ-ঘর সে-ঘর কোর্‌বো, গান কোর্‌বো, ঝগড়া কোর্‌বো ?' তিনি ঝরঝর কোরে হেসে উঠ্‌লেন। সে-হাসিতে কুয়াসা আছে, কিন্তু জ্বালা নেই,—পতঙ্গ যে-জ্বালা নিয়ে পুড়ে মরে।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হোয়ে বোল্‌লেন দেবব্রত : 'কেন, সে-আশা-কোরে কিছু অন্যায় কোরেছি আমি ? বয়েসের হিসেবটা ভুলে যাওয়াই তো মানুষের স্বভাব-ধর্ম। কিন্তু, একটা জিনিষ, তোমার আর-সবের পরিবর্তন হোয়েছে, কিন্তু, চোখ দুটো আজো তেম্‌নি আছে। সেই আভা-ভরা কালো দুটি চোখ।'

'কি যে তুমি বলো', লজ্জায় তাঁর মুখ রাঙা হোয়ে উঠলো : 'বুড়ো বয়েসে তোমার যতো সব—'

কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর দেবব্রত বোল্‌লেন, 'কী ভাব্‌ছো ঊর্মিলা ?'

'ভাব্‌ছি বাইশ বছর আগেকার কথা। সেই তুমি আর এই আমি—কতো প্রভেদ বলো তো।' তাঁর স্বর বিষণ্ণ, উদাস।

'সত্যি, 'দেবব্রত হাস্‌লেন : 'কী ছেলে-মানুষি যে কোরেছি। এখন সে-সব ভাব্‌লে হাসি পায়।'

তিনি যেন আশ্চর্য হোয়েছেন এম্‌নি ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে দেবব্রত-র মুখের দিকে চাইলেন : 'হাসি পায় ?'

'পাবে না ? আসলে, ভালোবাসা জিনিষটাই তো হাস্যকর। তা'কে অলস মনের কল্পনা ছাড়া আর তুমি কি বোল্‌বে !'

'হবে।' বহুদূর নির্জনতা থেকে তিনি যেন বোল্‌লেন : 'আসলে, আমরা সবাই হয়তো অভিনয় কোরে এসেছি। মুখে অন্তরংগতার মুখোস এঁটে পরস্পরকে ছলনাই কোরে এসেছি। কিন্তু তোমার কী কিছুই মনে নেই ?'

'না। ইচ্ছে কোরেই ভুলে গেছি। স্মৃতির বোঝা বয়ে লাভ নেই বলে'। ইস্কুলে যখন পড়্‌তুম,

তখন যে-সব ছেলেমি করেছি এখন তা' মনে রাখায় কী কোনো সার্থকতা আছে? সেন্টিমেন্ট্‌কে প্রশ্রয় দিয়ে তো কোনো লাভ নেই।'

'তা জানি। রাগ কোরো না, একদিন তুমিই ছিলে ভীষণ সেন্টিমেন্টাল্‌।'

'ওটা স্বাভাবিক। বয়েসের চপলতা। মনের দুকূল ছাপিয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সেন্টীমেন্টকে আশ্রয় না কোরে মানুষ পারে না। মানুষের দুঃখ তখন আমরা সইতে পারি না। নদীর কোন্ রূপটা আসল বোল্‌তে পারো? যখন সে স্থির, না যখন উত্তাল?'

'অতো ছোটো কোরে কোনো জিনিসকেই আমি ভাবিনি। দেখিনিও। যে-জিনিসকে চিরকাল সত্যি বোলে আঁকড়ে ধোরে ছিলাম, আজ তুমি কেন তাকে ভেঙে দিলে? আর কেনই বা এলে? আমার সত্যকে মিথ্যে বোল্‌বার জন্যে কী?'

'যা মেকি, তা'কে রাংতায় মুড়ে' 'আসল বলে' চালিয়ে লাভ আছে কিছু?'

'না থাক্, ক্ষতিও ছিলো না। যখন আমি আর বেশী দিন বাঁচছিনে।'

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ-কোরে রইলেন। রাত বাড়তে লাগলো। আকাশে চাঁদ পুড়ছে, তারা পুড়ছে। অন্ধকারের স্রোত মুখের উপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। দেবদারু গাছে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস। সেইদিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধের মতো তাকিয়ে থেকে তিনি বোল্‌লেন, 'একটা কথা বোল্‌বো, জবাব দেবে?'

তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বোললেন দেবব্রত : 'নিশ্চয়ই দেবো। বরাবরই তো দিয়ে এসেছি।'

'আজ তুমি কেন এলে? সেদিনের কথার জবাব নিতে কি? কিন্তু, এতো দেরি কোরে এলে কেন? আমি তো তার পরের দিনই মন স্থির কোরে ফেলেছিলাম।'

'কিসের?' দেবব্রত অবাক হোয়ে প্রশ্ন কোর্‌লেন।

'কিসের তা'ও তোমায় বলে' দিতে হবে? তোমার মনে পড়ে না?'

আরো বিস্মিত হোয়ে দেবব্রত বোল্‌লেন : 'না তো!'

'না?' তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনা : 'আশ্চর্য! অথচ আমার ঠিক মনে আছে। পুরুষরা এম্‌নিই। তাদের 'সিরিয়াস' হোতে যতক্ষণ, তা ঝেড়ে ফেল্‌তে ততোক্ষণও নয়। 'কি স্থির কোরেছিলাম জানো? তুমি যার জবাব চেয়েছিলে, তার। তোমার কথায় রাজি হবো বলে'। তুমি চলে' গেলে পর আমি বুঝ্‌তে পারলাম, অবলম্বন ছাড়া আর যারই চলুক, মেয়েদের চলে না। কিন্তু, বড়ো দেরি কোরে বুঝ্‌লাম। এই বাইশটে বছর আমার কি কোরে কেটেছে, তা যদি জান্‌তে তুমি! ছ'মাস পর তোমায় কতো খুঁজলাম, কোনো জায়গায় তোমার সন্ধান পেলাম না। শুনলাম, তুমি বিলেত গেছো।'

দেবব্রত-র চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌লো—বাইশ বছরের অতি-তন্বী একটি ঝরঝরে মেয়ের শরীর, আগুনের শিখার মতো ঋজু ও রক্তিম। আর সেই আভা-ভরা কালো চোখ, সেই বাঁকানো রক্তিম ঠোঁটে যৌবনের পিপাসা, হাসির চকিত ঝলসানি। উর্মিলা যেন বাইশ বছর আগে তাঁর সাম্‌নে

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর সিঁথিময় ছড়ানো চুলের ঐশ্বর্য, ম্লান করুণ তাঁর মুখ, দীর্ঘশ্বাসের মতো কাঁপ্‌ছে তাঁর চোখের হাল্‌কা পালকগুলি। বঙ্কিম হাসিতে তাঁর ঠোঁট বারেবারে কুঁচ্‌কে উঠ্‌ছে, কারণ-অকারণে তিনি হেসে উঠ্‌ছেন, গান কোর্‌ছেন, ঝগড়া কোরছেন।

দেবব্রত যেন কী হোয়ে গেলেন! বহুদিন পর স্মৃতির ঝাপ্‌টা এসে লাগলো তাঁর বুকে, উড়িয়ে দিলো যতো-কিছু বিস্মৃতির ধূলি আর আবর্জনা। উর্মি লা! তাঁর প্রথম যৌবন-স্বপ্ন, সেই যৌবনের স্বাদ, সেই উর্মিলা জীবনের গোধূলিতে সামান্যতম ধূসরতা না রেখেই কী অস্ত গিয়েছে!

তিনি তখনো বলে' চোলেছেন : 'এতো বড়ো বাড়ি, আমি একা, কেউ নেই। ভাব্‌তে পারো!...তিনি হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লে নিলেন : 'হ্যাঁ, তুমি এখন আছো কোথায়? কী কোর্‌ছো?'

'আলিপুরে বাড়ি কোরেছি। এখন রিটায়ার কোরে পেন্‌সন নিচ্ছি।'

'আলিপুরে কোর্‌লে কেন? এদিকেও তো কোর্‌তে পার্‌তে। বেশ ফাঁকা হাওয়া আছে, রোদ আছে। আর কী চাই?'

যেন ইতস্ততঃ গলায় বোল্‌লেন দেবব্রত, 'সস্তায় জমি পেয়ে গেলুম। আর তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া দূরে লুকিয়ে থাকতে চাও এখন, তা' বেশ কোরেছো, বেশ কোরেছো। কিন্তু, খবরটা আমাকে যদি একবার জানাতে, তাহোলে—'

'বলো, কি তাহলে?'

'থাক্, পুরোনো কথার জের টেনে লাভ নেই, দেবব্রত। চা খাবে না-কি?'

'না না, অনেক রাত হোলো, আমি এখন উঠি। আরেক দিন সময় কোরে এসে চা খেয়ে যাবো।'

দেবব্রত উঠ্‌লেন, পকেট থেকে একটা লাল বড় খাম বা'র কোরে উর্মিলার হাতে দিয়ে বোল্‌লেন, 'পর্শু আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি যাবে। মিসেস বসু অনেক কোরে বোলেছেন।'

'তোমার মেয়ে! বলো কী? কতো বয়েস, কেমন তাকে দেখ্‌তে হোয়েছে? আশ্চর্য লোক ত তুমি! কবে বিয়ে কোর্‌লে?—শুভ সংবাদটা এতোক্ষণ আমায় বলোনি কেন? তোমার উপর ভয়ানক রাগ কোরেছি দেবব্রত।'

তাঁর হাতে হাত রেখে অপরাধীর গলায় দেবব্রত বোল্‌লেন, 'আমাকে ক্ষমা কোরো উর্মিলা।'

তারপর কখন যে দেবব্রত চোলে গেছেন, তিনি টের পান্‌নি। লাল চিঠিখানা কাঁটার মতো আট্‌কে আছে তাঁর করতলে। কী কোরেছেন তিনি? কেন তিনি জীবনে এই ভীষণ ভুল কোর্‌লেন? দেবব্রত একটু আগে যা বোল্‌লেন, তা-ই কী সত্যি!

তারপর আরো রাত হোলো। অশুভ আত্মার মতো অন্ধকার নেমে এলো তাঁর বাড়িতে। তাঁর গালে যে ক'টি অশ্রুর দানা জমে'ছিলো, তা তিনি আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন। চাকরকে উদ্দেশ কোরে বোল্‌লেন, 'ওরে তিনকড়ি, ড্রাইভারকে গাড়ীটাকে বা'র কোর্‌তে বল্, সিনেমায় যাবো।'

কাঠ

দিনেশ দাস

জ্বলন্ত বোম্-শেলের বহ্নি উড়ে
নীল অরণ্য লাল হয়ে ওঠে দূরে :
অরণ্য হবে কয়লায় পরিণত,
মানুষের খুলি চৌচির হবে ঠুন্‌কো কাঠের মত :
তোমার দেহের দুশো অস্থির দুখানি আস্ত হাড়
যুক্ত রবে না আর !

অদূরে আবার হাজার কেউটে ফণা তোলে উদ্যত,
কেউটে কোথায় বিষাক্ত গ্যাস ফুঁসিতেছে অবিরত !
গ্যাস !
উল্‌টিয়ে যাবে মদের গেলাস আর দেহ বিন্যাস।
গ্যাস—গ্যাস জাননিত ?
নিমেষে লক্ষ জীবন-সূর্য্য হবে যে অস্তমিত।
অসংখ্য অসহায়
চিতায় উঠবে হায় !

চিতা ?
অত কাঠ কই জ্বলিবে দীপান্বিতা ?
লক্ষ লক্ষ চিতা—
কেওড়াতলায় অত কাঠ কোথা মিতা !
শ্মশানে-শ্মশানে কাঠ তো যাবে না কেনা,
আমার দেশের যত অরণ্য অত কাঠ মিলিবে না !

একটী কবিতা

হীরালাল দাশ-গুপ্ত

মহাকাল পদক্ষেপ এইখানে পেলো বুঝি পাষাণের রূপ !
মৃত্তিকার মৃতমাংস জমে' জমে' শাদা হোয়ে হাড় হোয়ে গেল !
নির্য্যাতিত কতো ঝড়, কতো রৌদ্র আর কতো বন্য ব্যভিচার—
নিষ্করুণ কঙ্কালে কঙ্কালে এই প্রাণহীন পৃথুল পাষাণ !
ধ্বসরিত মেরুদণ্ড
অগ্রে বক্রে শ্বেত শীলা
শীর্ণ সম্পীড়ন
শূন্যে শূন্যে সুষমা সর্পিল।
নিষ্ঠুর শীতল দেহ,
তিক্ত প্রাণ-রস—
এইখানে শুয়ে আছে মানুষ-জননী।
এখানে প্রসব তার—
এখানে পালন—
তির্য্যক প্রসার কোনও অম্লাক্ত উষায়।

এইখানে আসিয়াছে তারা,
ভিড় কোরে আসিয়াছে অর্থহীন অক্ষরের মতো—
মাছের ডিমের মতো দলিয়া পিষিয়া আসিয়াছে—
অবজ্ঞায় আসিয়াছে তাহার শাবক।
তাহার শাবক আজ তাহারে ছাড়িয়া গেছে কোথায় বলো তো !
এখানে এখন কিছু নাই—
শুধু শূন্য শুভ্র শূন্যতায়।

তবু তারে আমি ভালবাসি।
তার অঙ্গ উপাঙ্গবিহীন—
পরিশিষ্ট প্রস্তর কেবল।

অঙ্গে অঙ্গে অভ্র অলঙ্কার,
ভূতলের তলে তলে প্রস্তর পঞ্জর—
প্রাণহীন পাষাণ পৃথিবী
অতি পুরাতন!

শুয়ে আছে পুরাতন—পৃথিবীর মতো পুরাতন—
শুয়ে আছে পাষাণ-পৃথিবী—
মৌন সাক্ষী কালের যাত্রার!
কতো সূর্য্য জ্বলে তার অন্তর-আকাশে—
কতো চাঁদ গলে' গলে' যায়—
দিয়ান, আইসিস্ আর কতো আর্টেমিস্
আরক্তিম স্পর্শে আর মদির নিঃশ্বাসে তারে রহস্য-ধূসর করিয়াছে।

—এই স্বপ্ন
এই সৃষ্টি
জীবন
মরণ
এ কি শুধু কোটি-কোটি জীবাণু স্পন্দন?
স্পন্দমান চক্রে চক্রে শুধু চক্রমন?
স্মৃতি আর বিস্মৃতির আলো-ছায়া-অন্ধকার অরণ্যে অরণ্যে
কামনার কৃষ্ণসর্প লুক্কায়িত গহ্বরে গহ্বরে।
আমাদের অচেতন হতবুদ্ধিতায়
জন্ম আর মৃত্যু আর আগামী অতীত সব আবিল আচ্ছন্ন হোয়ে
ধরিতেছে বাস্তবের রূপ।

স্বপ্ন দেখি অশরীরী অনিন্দ্য সুন্দরী—
অঙ্গে অঙ্গে উর্ব্বশীর অপাঙ্গ ইঙ্গিত—
মেঘে মেঘে নীলাম্বরী ওড়ে!—
সব রূপ এক রূপ হোয়ে যদি অপরূপ হোতো!

স্পন্দমান বিহ্বলতা ক্রম-বর্দ্ধমান
ধীরে ধীরে রচিতেছে স্বপ্ন-চক্রবাল—
ধূসরিত শীলা-চিত্র স্থবির নারীর!
কাল-কীর্ণ কঙ্কালে কঙ্কালে তার দীর্ঘশ্বাস সমুদ্র-শীতল!
ঈগলের মতো আর সাপের মতোন,
অতিকায় বিগলিত বৃষের মতোন
অচঞ্চল পিঙ্গল পাষাণী!
শরীরে শরীরে তার ক্লীবত্বের নিষ্ঠুর কামনা,
শূন্য-শিখা উদগ্র উত্তাপ;
সহস্র স্ফুলিঙ্গ অঙ্গ হাউই-র মতোন
অসমর্থ সামর্থ্য ধারণে।

তবু তার অবয়ব উন্মীলিত আকাশের মতো—
অনন্ত যৌবন যেন জীর্ণ যৌবনার!

সাহিত্য ও গণসাহিত্য

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

গত মহাযুদ্ধের হট্টগোল থেমে যাবার পর পৃথিবীর চিন্তা-রাজ্যে কয়েকটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিলে। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ববাদের ব্যাপক বিস্তারে দুনিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভাঙন ধরলো—দীর্ঘদিন প্রচলিত যে নীতি ও বিধিকে আশ্রয় করে' মানুষের সভ্যতা এগিয়ে এসেছে, তার পেছুনে যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি লুকিয়ে আছে, এটা এর আগে এমন করে' আর জানা যায় নি। এই ফাঁকিটা যেদিন ধরা পড়লো, সেদিন মানুষ বুঝলো, পৃথিবীর সভ্যতা বলো, সংস্কৃতি বলো, ধর্ম্ম বলো আর শিল্প বাণিজ্যই বলো সব-কিছুই দাঁড়িয়ে আছে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর সুবিধার জন্যে—আর লক্ষ-লক্ষ মূক জনসাধারণ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, বুকের রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে তাদের সেই অব্যাহত সুবিধার পথ প্রশস্ত করে' দিচ্ছে। তাদের এই অজ্ঞতা ও অসহায়তার সুযোগেই ওদের সুখ ও সৌভাগ্যের কারবার।

বিশ্বের জনগণকে এর পর থেকে দুটো মোটা ভাগে ভাগ করা হ'তে লাগলো—যাদের আছে, আর যাদের নেই। যাদের আছে, সংখ্যায় তা'রা সামান্য হ'লেও দুনিয়ার অর্থ-ভাণ্ডার তাদের হাতে—তাই খাটিয়ে তা'রা কল-কারখানা, কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁদছে; যাদের নেই তা'রা পেটের দায়ে এই সব জায়গায় মেহনৎ করছে, তাদের দেহের শক্তি ও মনের একাগ্রতা দিয়ে এই সব কারবারে সোনা ফলাচ্ছে, তার বিনিময়ে মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ পাচ্ছে কিছু-কিছু কেতন—আসল লভ্যাংশ যা, তা গিয়ে জমা হচ্ছে ধনিকদের তহবিলে, দরিদ্রের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। এই কৃচ্ছ্রলব্ধ যৎসামান্য আয়ে তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটে না, তা'রা লেখাপড়া শিখতে পারে না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আয়েস পায় না, পশুর মতো ক্ষুন্নিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'রেই তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' ধনীদের সৌভাগ্যের ইমারত গড়ে' চলেছে। এই মুষ্টিমেয় ক্ষমতাপন্নের তহবিলে সঞ্চিত কোটি-কোটি টাকা দুনিয়ার বাজারে ঝিক্‌মিক্ করছে, তার বাইরের জৌলুষে সংখ্যাতীত দরিদ্রকে উদ্‌ভ্রান্ত করছে এবং তাদের অকারণ খাটিয়ে নিয়ে পুঁজিবাদীদেরই পেট ভরাচ্ছে। তা'রা ন্যূনতম পারিশ্রমিকে প্রচুরতম উৎপাদন করিয়ে মোটা-মোটা অঙ্ক ব্যাঙ্কের খাতায় তুলছে—ব্যবহারিক জীবনের যা-কিছু সম্পদ, বিজ্ঞানের যা-কিছু অবদান, সবই তাদের জন্যে। কৃষক হ'ক, কুলী হ'ক, আর কেরানী কর্ম্মচারীই হ'ক, সবাই হ'ল এই পুঁজিবাদীদের সৌভাগ্য-সাধনের যন্ত্রমাত্র—এদের নিজস্বভাবে বাঁচার কোন অধিকারই নেই।

বলা বাহুল্য, এই বিভেদ একদিনের সৃষ্টি নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' এই জিনিষ চলে' আসছে—কিন্তু মানুষ কোনদিনই মানুষের এই অসহায়তা, এই বাধ্যতামূলক

আত্মঅপচয়কে সোজা দিক থেকে ধরতে পারেনি। চিরদিন শুনে এসেছে তা'রা যে কর্ম্ম অনুসারে জন্ম এবং জন্মগত দুর্ভাগ্য অনতিক্রমনীয়; তাই রাজা, গুরু, পুরোহিত, মালিক, মহাজন—এক কথায় পুঁজিবাদের সহায়ক সব রকম প্রতিনিধিকেই তা'রা অক্ষুণ্ণ গৌরবে আপনার ওপর প্রভুত্ব করতে দিয়েছে। এই আত্মসমর্পনের ওপরই গড়ে' উঠেছে বিশ্বের তথাকথিত সভ্যতার ইতিহাস, যা'তে গরীবের কোন স্থান নেই। ইতিহাসে স্থান হয়েছে শাজাহানের, যে দরিদ্রকে বুকের পাঁজর খসিয়ে তাজমহল বানাতে বাধ্য করেছিল! পৃথিবীর সভ্যতার কাহিনী তাজমহলের মহিমান্বিত সুষমায় ঝলমল করেছে, কিন্তু এর পেছুনে কত নিরন্নের অশ্রু, কত উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস, আর কত অভাগ্যের আত্মদান সঞ্চিত, সে-কথার কোন সাক্ষী নেই! এম্নিধারা আরো সব ব্যাপারই।

বিংশ শতাব্দীতেই মানুষ প্রথম টের পেলো যে মানুষে-মানুষে এই বৈষম্যের মূলে কোন অনির্ব্বচনীয় দৈবীশক্তির হাত নেই—এ হ'ল মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীর বুজ্‌রুকির ফল। তা'রা মানুষকে শাসন এবং শোষণ করবার কৌশলেই দিয়েছে প্রাক্‌ব্যবস্থিত দৈব-শক্তির দোহাই—বলেছে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, জীবিকার্জ্জন, শিল্পচর্চ্চা, শিক্ষা কোন বিষয়েই তুমি পাবেনা আত্মস্বতন্ত্র পথে চলবার অধিকার—তোমাকে ডাকতেই হবে গুরুকে, পুরোহিতকে, রাজাকে, জমিদারকে, মালিক-মহাজন, কুলপতি, সমাজপতিকে—তাদের আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করতে হবে, তাদের করতলগত শাস্ত্র, শস্ত্র এবং সঞ্চয়কে শ্রদ্ধা দিতেই হবে। দুর্ব্বল, অশক্ত, অনভিজ্ঞ জনগণ নতশিরে বলেছে তথাস্তু, আর তারই ফলে তথাকথিত সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং ধর্ম্ম-ব্যবস্থা পরস্পরের অনুপূরক রূপে পৃথিবীতে শাখাপল্লবে ছড়িয়ে পড়ে' পুঁজিবাদকে পুষ্ট করেছে এবং কৌশলী ভাগ্যান্বেষীদের করেছে কল্যাণ-সাধন, আর সাধারণকে করেছে সর্ব্বহারা।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যেদিন এই পরম সত্যটি আনুপূর্ব্বিক বুঝতে পারলো, সেদিন সে চীৎকার করে' বললো, সমাজ ভাঙো, রাষ্ট্র বদলাও, ধর্ম্ম ওঠাও! মানুষকে দাও মানুষের অধিকার—ছজুরে মজুরে, বড়োতে ছোটতে, এই বৈষম্য—একের প্রয়োজনাতিরিক্ত লাভ, অন্যের ন্যূনতম প্রয়োজনেও অসঙ্গতি, এ চলবে না—পুঁজিবাদীদের ভাঁড়ার থেকে দুনিয়ার সঞ্চিত টাকা প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে বা'র করো, অকৃপণ দু'হাতে চারিদিকে ছড়িয়ে দাও—ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার, শিক্ষা-সংস্কৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বজনের মধ্যে সমান অধিকার বণ্টন করে' দাও। কেউ ইহলোকের, কেউ পরলোকের কাণ্ডারী সেজে এতকাল মানুষকে যেভাবে যুগবদ্ধ পশুর মতো চালিয়েছে, তার প্রতীকার চাই। এই চেতনার ফলেই রাশিয়ায় প্রথম দেখা দিল সমাজতন্ত্রবাদ—যা প্রথমেই বিলোপ করলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির, এবং দেশের সমস্ত অর্থ, সমস্ত কাজ-কারবার নিয়ে এলো রাষ্ট্রের আয়ত্তে, তারপর তাড়ালো ধর্ম্মকে—ছোট বড়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সকলকেই থাকতে হবে রাষ্ট্রের অধীনে, খাটতে হবে রাষ্ট্রের হয়ে, তার বিনিময়ে রাষ্ট্রই দেবে প্রয়োজনানুরূপ আহার্য্য, পরিধেয়,

আমোদ-প্রমোদ, আর সবই। কেউ কারুর মালিক নয়, মহাজন নয়, কারুকে কারুর আদেশ-নির্দেশ, অনুরাগ-বিরাগের মুখ চেয়ে বাঁচতে হবে না—ক্রিয়া-কর্ম্ম বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক ব্যাপারে প্রত্যেকেই ভোগ করবে অব্যাহত স্বাধীনতা, কোথাও গুরু-পুরোহিত বা শাস্ত্রকার তার পেছনে শাসনদণ্ড উঁচিয়ে থাকবে না। অর্থাৎ দারিদ্র্য-নামক বস্তুকে তা'রা পৃথিবীর ইতিহাস থেকেই বিতাড়িত করতে চাইলো। সেই সঙ্গে চাইলো তারই আনুষঙ্গিক আর যা-কিছু কুব্যবস্থাকে।

কার্য্যতঃ সম্ভব হ'ক আর না হ'ক, এই মত বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে একটি ভাব-বিপর্য্যয় এনেছে। সমাজতন্ত্রবাদের বিস্তার এবং সাফল্য ভিন্ন যে পৃথিবীতে কোনদিনই ভারসাম্য আসবে না, মুষ্টিমেয় বিত্তশালী যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে' রাখবে এবং দরিদ্রেরা তাদের দরজায় করবে দাস্য, ততদিন পৃথিবীতে কিছুতেই যে শান্তি আসবে না, একথা আজ সবাই বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসকে সমাজতন্ত্রবাদই অবশ্য দিয়েছে প্রথম প্রবর্ত্তনা, কিন্তু পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতির মূলতত্ত্বগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করে', তাঁদের পেছনে জড়ের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক উদ্ঘাটিত করে' না দেখালে এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তির অলঙ্ঘ্যতার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না করলে, এই বিশ্বাস কখনই দানা বাঁধতে পারতো না। এই ত্রি-মুখী ভাব-বিপ্লব একই সঙ্গে দেখা দিয়েছে, এ-যুগের এই সব চেয়ে বড় গৌরব।

এ-যুগের সাহিত্য এই বিপ্লব থেকেই প্রাণ-প্রেরণা আহরণ করেছে, তাই আজকের সাহিত্যেও সব দিকেই ভাঙনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতকাল যে-সমস্ত বাঁধা-বরাদ্দ আদর্শ অনুসরণ করে' সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছে, আজ তা' বর্জ্জন করা হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য ও বাস্তবতা' প্রবন্ধে আমি নবযুগের সেই সাহিত্যাদর্শের এক দিক নিয়ে আলোচনা করেছি, সুতরাং সে-প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করবো না। এই প্রবন্ধে তারই আনুষঙ্গিক রূপে আর একটি নতুন দিক যা এসেছে সাহিত্যে, সে-সম্বন্ধেই দু'একটি কথা বলার চেষ্টা করবো।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের সুদীর্ঘ ভূমিকা যাঁরা ধৈর্য্য ধরে' পড়েছেন, তাঁদের কাছে গণ-সাহিত্য বলতে কি বোঝায়, তা আর সম্ভবতঃ ব্যাখ্যা করে' বোঝাবার আবশ্যকতা নেই এবং এই পর্য্যায়ের সাহিত্য কি চায়, তাও তাঁরা অনেকটা উপলব্ধি করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। বিশ্বের সাহিত্য চিরদিন শুধু সম্পদের জয়গান করে' এসেছে—রাজা রূপে, বীর রূপে, সন্ন্যাসী রূপে যারা সহস্র চক্ষুর সাম্নে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে, তাদের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার গুণগানেই পৃথিবীর সাহিত্য ভরপুর থেকেছে। তাদের মিলন-বিরহ, তাদের সফলতা-ব্যর্থতা, তাদের ক্ষমতা-অক্ষমতাকেই কবিরা সাহিত্যিকরা নব নব রূপে চিত্রিত করেছেন। দীন দুঃখী অসহায় অশক্তেরা পর্য্যন্ত অনশনে অর্দ্ধাশনে থেকে সেই বিলাস-লালিত ব্যসন-পুষ্ট সৌভাগ্যবানদের দুঃখেই কেঁদেছে, আনন্দে উল্লসিত হয়েছে—

তাদের দুরধিগম্য উচ্চতার সাম্নে দাঁড় করিয়ে, অকৃতার্থ হতভাগ্য রূপেই নিজেদেরকে ধিক্কার দিয়েছে এবং তাঁদেরকে লোকাবতার জ্ঞানে পূজা করেছে। ব্যবহারিক জীবনে তা'রা যেমন সকল ক্ষেত্রেই মেনেছে পুঁজিবাদীদের কর্ত্তৃত্ব, ভাব-জীবনেও তেম্নি পুঁজিবাদীদের প্রাধান্যই করেছে তাদের অভিভূত—বরং চিন্তার দিক থেকে, কল্পনার দিক থেকে, আশা-আকাঙ্খা অনুরাগ ও স্বপ্নের দিক থেকে পুঁজিবাদের মহিমার মোহ তাদেরকে এম্নি প্রবলভাবেই আক্রমণ করেছে যে বাস্তবের পুঁজিবাদেও তা'রা দোষের কিছু দেখতে পায় নি। রাজা রামকে যারা জেনেছে ভগবান বলে,' তাদের কাছে রাজার আসন পূজার্হ রূপেই সম্মান পেয়েছে—তা সে-রাজা যতই কেন না অত্যাচারী হ'ক। দরিদ্র বিদুরকে পোষা কুকুর করে' আঁকা হয়েছে, তা'তে কোন দরিদ্রই রাগ করেনি, তার কারণ এ হেন ভিখারী বিদুরকে রাজা ও রাজানির্ম্মাতা কৃষ্ণ অনুগ্রহ করতেন, তার ক্ষুদ এক মুঠো করে' নাকি খেয়েছিলেন! বিদুরের ভাগ্য নিয়ে বরং অশ্রুপাতই দেখা গেছে বরাবর।

সাহিত্যের ভেতর দিয়ে শ্রেণীস্বার্থকে এমন কৌশলেই উপস্থিত করা হয়েছে যে গরীবেরা তা ধরতে পারেনি, এমন কি নিজেদের শোচনীয় অবমাননাতেও তা'রা সঙ্গতিরই পরিচয় পেয়েছে। দরিদ্রকে দাস রূপে, আশ্রিত রূপে, ভাঁড় রূপে সাহিত্যের আসরে যেটুকু স্থান দেওয়া হয়েছে, তাতেই তা'রা কুণ্ঠিত সঙ্কোচে নিঃশব্দে থেকেছে এবং যারা পড়েছে, তা'রাও তাতে অন্যায় কিছুই দেখতে পায় নি। প্রাচীন যুগে, মধ্য যুগে, এমন কি আধুনিক যুগেও একই অবস্থা চলে' এসেছে। অথচ মজা এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকেরা নিজে ছিলেন দরিদ্র, তা' সত্ত্বেও দরিদ্রের সম্মানকে তাঁরা কোনদিনই স্বীকার করে' নেন নি। কারণটা সহজেই অনুমেয়—দারিদ্র্যকে একটা গ্লানি ও অপমানের বিষয় ব'লেই মনে করা হ'ত, ধনীদের সুখ, সমৃদ্ধি, আরাম-আয়েসের দিকে সলোভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং নিজের বাস্তব অবস্থাকে সর্ব্বদৃষ্টির অন্তরালে গোপন রাখাই ছিল সেই জন্যে একমাত্র পন্থা। অর্থাৎ ভাবটা এই ছিল যে আমরা রামা-শ্যামারা মানুষই নই, আমাদের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার আবার দাম কি? মানুষ তা'রাই যারা জন্মেছে রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে, যারা শোয় সোনার খাটে, পা রাখে রূপোর খাটে—যাদের অঙ্গুলী নির্দ্দেশে আমাদের মতো কোটি-কোটি হতভাগা কুকুরের মতো ছুটে আসে—তা'রা যদি ভালবাসে, তবে সেই হ'ল ভালবাসা; তা'রা যদি কাঁদে তবে সেই হ'ল কান্না, তা'রা যদি কষ্ট পায়, তবে সেই হ'ল কষ্ট···সুতরাং তাদের নিয়েই হবে সাহিত্য, শিল্প, যুগ যুগ ধরে' মানুষ শুধু গাইবে তাদেরই গান—আর আমরা? আমরা কোন্ লজ্জায় পৃথিবীর সাম্নে তুলে ধরবো নিজেদের? এই ভ্রান্ত জীবন-বেদের প্রভাবেই লেখকেরা দরিদ্র হয়েও, দারিদ্র্যকে গোপন করেছেন, অপমানিত হয়েও অপমানকে গায়ে মাখেননি, ধনিকের বনিকের মহাজনের মালিকের রাজার ঋষির গুণগান করে' পরোক্ষভাবে শ্রেণীস্বার্থকে পুষ্ট করে' গেছেন এবং গণসাধারণের গলার ওপর দিয়ে চালিত পুঁজিবাদের রাজরথে এই ভাবে করেছেন গাড়োয়ানী। তা সে কি বাল্মীকি

বেদব্যাস কালিদাস ভবভূতি, আর কি হোমর ভার্জ্জিল সেক্সপীয়ার মিল্টন! সবই আভিজাত্যের কবি। ফরাসী বিপ্লবে যেদিন ক্ষিপ্ত গণসাধারণ রাজা, সামন্ত ও পাত্র-মিত্রকে নির্ব্বিচারে হত্যা করে' সমানাধিকার দাবী করেছিল, সেদিনই ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম মনে হয়েছিল দরিদ্রের একটা অস্তিত্ব আছে বটে এবং তা উপেক্ষণীয় নয়। তারপর যে-সাহিত্য জন্মেছিল, ফ্রান্সের দোদে, জোলা, হুগো, ব্যালজাক, মোপাসাঁয় বা ইংল্যাণ্ডের ডিকেন্স, থ্যাকারে, হার্ডি, মেরিডিথে, তাতে পুঁজিবাদীদের জায়গায় এসেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যারা পুঁজিবাদীদেরই এজেন্ট, বুদ্ধিজীবিতার দ্বারা পরোক্ষভাবে যারা শ্রেণীস্বার্থকেই করছে পালন এবং পোষকতা। মন্দের ভালো! এর পর থেকে গরীব আর সাহিত্যে যোগানদার হয়ে আসে না, আসে পাত্র পাত্রী হয়েই এবং তার সুখ দুঃখের রূপটাও আমরা দেখতে পাই পূর্ণতর রূপে—যদিও সে-রূপের ভেতর একটা অনুকম্পা, একটা 'আহা বাছারে' ভাব কিছুতেই গোপন থাকে না! তারপর রুশ বিপ্লবের পর এলো গণসাহিত্য—যা মধ্যবিত্তের মতো অনির্ভরযোগ্য সম্প্রদায়কেও উচ্ছেদ করে' তার স্থানে বসালো সর্ব্বহারাদের—কুলী, মজুর, কৃষক থেকে সুরু করে' চোর, ডাকাত, খুনী, জালিয়াত, বেশ্যা, ঝি, মেথরাণী পর্য্যন্ত, এক কথায় যারা গণসাধারণ, তাদেরকে দিলে সাহিত্য মন্দিরের দরজা খুলে। তা'রা হুড়মুড় করে' এসে ঢুকলো এবং বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতে বাবুভায়া উকিল মোক্তার ডাক্তার, এক কথায় তথাকথিত ভদ্র সমাজের সংরক্ষিত স্বার্থের ব্যূহ ভেঙে চুরমার করে' তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করলো নিজেদেরকে। এই ভদ্র সমাজ উনবিংশ শতাব্দীতে তাড়িয়েছিল রাজতন্ত্র ঘেঁষা লোকদের—বিংশ শতাব্দীতে গণসাধারণ আবার তাড়ালো এদের। গোর্কি, কুপ্রিন প্রভৃতি করলেন সেই মহৎ কার্য্য।

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টা কি জন্যে অনির্ভরযোগ্য। এরা সুযোগ পেলে কয়েক ধাপ এগিয়ে অভিজাত হয়, আবার সুযোগ না পেলে পেছু হট্‌তে হট্‌তে গণসাধারণের মধ্যে নেমে আসে। অর্থাৎ এটা একটা মধ্যাবস্থা, যা সর্ব্বদা অনিশ্চিত। অন্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশে এই সম্প্রদায়ের পরিমাণ বোধহয় সব চেয়ে বেশী। কোম্পানীর রাজ্যশাসন চালাবার প্রয়োজনে গণসাধারণের মাঝখান থেকে যাদের একদা টেনে আনা হয়েছিল তথাকথিত উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির লোভ দেখিয়ে, তাদের সন্তান-সন্ততিরাই আজ ডালে-পল্লবে ছড়িয়ে পড়ে' এদেশের ভদ্র সমাজ নামে অভিহিত হয়েছে—এরা চাকুরিজীবী, এবং সেই জন্যেই ক্যাপিট্যালিষ্টদের এজেন্ট—অথচ এরা গরীব; কিন্তু গরীব হ'লেও এরা গণসাধারণ থেকে অনেক তফাতে অবস্থিত। এদের দৃষ্টি নিবদ্ধ অভিজাত সমাজের দিকে, এদের সাধনা সেই স্তরে উন্নীত হবার জন্যেই—এরাই এদেশের সাহিত্যিক, তাই এদেশের সাহিত্যে তথাকথিত মধ্যবিত্তেরই আসন আজো কায়েমি রয়েছে।

সমাজতন্ত্রবাদ সব দেশের মতোই এ দেশের চিন্তাতেও সংক্রামিত হয়েছে, তার ফলে সাহিত্যে তার পদসঞ্চারও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সুলক্ষণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে কালকেতু ব্যাধ ও তার পত্নী দরিদ্র ফুল্লরার এবং ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে কালুডোমের কাহিনী স্থান পেয়েছে—ময়মনসিংহ গীতিকাতেও আছে বেদে, বাগ্দী, ডোম, চাঁড়ালের অনেক কাহিনী—কিন্তু বর্ণাশ্রমের ঝাঁটুনি এবং শ্রেণী-স্বার্থের জুলুমবাজীই নিয়েছে সর্ব্বক্ষেত্রে সিংহভাগ। অজ্ঞাতসারে অন্ত্যজরা যেখানে এসে পড়েছে, সেখানে পদাঘাত খায়নি ঠিকই, কিন্তু তা'রা দেশের মনে কোন স্থায়ী দাগও কাটেনি। মাণিকচাঁদ, গোপীচাঁদ, লাউ সেন, কর্পূর সেন, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, গোরক্ষ নাথ, মীননাথ, চোরাদী নাথের জয়ধ্বনিতেই বাংলা দেশ মুখরিত হয়েছে—কালকেতু ব্যাধ, হামরু সর্দ্দার, কালু ডোম পূজা-মণ্ডপের বাইরে করজোড়েই দাঁড়িয়ে থেকেছে, তাদের সসম্মানে কেউ ভেতর বাড়ীতে ডেকে আনে নি—তা'রা নিজেরাও আসতে সাহস করে নি।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির কোনই সম্বন্ধ ছিল না—ব্যক্তি সাধারণ ছিল আপন আপন পল্লীভবনে বহু দুঃখ দারিদ্র্যের ভেতর নানা ভয় ও নানা আপদ-বিপদকে বুকে আঁকড়ে। বাহিরে মুসলীম শাসনের বহু অত্যাচার গেছে তাদের মাথার উপর দিয়ে, ভেতরে বর্ণাশ্রমের শাসনও কম অত্যাচার করেনি—কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে গণ-জাগরণ কোনদিনই হয়নি এদেশে, এক কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ছাড়া—তাই এদেশের প্রাচীন সাহিত্যে গণসাধারণের কোন সত্যকার রূপই পাওয়া যায় না। অবশ্য তা পাওয়া যায় না মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যেও, যদিও সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কটা ছিল অনেক ঘনিষ্ট। সেখানে Knights, Baronsরাই আড়াল করে' রয়েছে সাধারণ মানুষকে—আমাদের সাহিত্যে যে জায়গায় রয়েছে অর্দ্ধপৌরাণিক দেব-দেবীরা।

ইংরেজী আমলে বঙ্কিম, মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথ—তিন জন শ্রেষ্ঠ লেখকের হাত দিয়ে বাংলার আধুনিক সাহিত্য গড়ে' উঠলো। কিন্তু নীলদর্পণ রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র ছাড় আর কেউই গণসাধারণের দিকে তাকালেন না—বঙ্কিম ও মাইকেল রইলেন আদর্শ নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ রইলেন ভাবতন্ত্রে নিমগ্ন। মিল্টন, স্কট, শেলী প্রমুখ শ্রেণী সাহিত্যিকের প্রভাব এজন্যে দায়ী, এজন্যে দায়ী হিন্দু কলেজের ভেতর দিয়ে প্রচারিত সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী জাতির শিক্ষাদান প্রণালী! তারপর এলেন শরৎচন্দ্র—যিনি তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা পাননি, তথাকথিত অভিজাত সমাজেও জন্মান নি—তিনি জন্মেছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে এবং সেই পারিপার্শ্বিকেই মানুষ হয়েছিলেন, তাই প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও গণসাধারণকে তিনি চিনেছিলেন—সাপুড়ে, চাষী, জোলা, লাঠিয়াল, বাগ্দী, ডোম, ঝি, চাকর, বেশ্যা··· গণসাধারণের অনেক পর্য্যায়কে বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম আমদানী করলেন। তাঁর পর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যিকেরা আরো কিছুদূর এগিয়েছেন—কিন্তু সত্যিকার গণসাহিত্য বাংলায় আজো লেখা হয়নি।

তার একটা কারণ অবশ্য এই যে এদেশের সাহিত্যিকেরা সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—যাঁদের জীবিকা চাকুরী এবং সেই কারণেই শিক্ষা দীক্ষা এবং চিন্তা চেষ্টায় এঁরা গণসাধারণ থেকে তফাৎ। সাহিত্যে তাদেরকে মর্য্যাদার আসন দিতে হ'লে, তাদের সঙ্গে যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার, তা' এঁদের নেই—কাজেই এঁরা দূর থেকে সহানুভূতির তাগিদে কল্পনার সাহায্যে যা লেখেন, তার ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায় শ্রেণীস্বার্থেরই খিঁচ—যেমন অভিজাত সমাজ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা না নিয়েই যা লেখেন, তার ভেতর থেকে যায় স্বল্পবিত্ত গৃহস্থ সমাজের ছাপ! অর্থাৎ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অটুট থাকতে সত্যিকার গণসাহিত্য হওয়াই সম্ভব নয়। তবে মধ্যবিত্ত সমাজে অবিবাহ, বেকার দশা, প্রত্যক্ষ সংস্রবহীন শিক্ষা, নানা আপদ যে-রকম ফিপ্রতার সঙ্গেই সঞ্চারিত হচ্ছে, তাতে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা এরকম আর বেশী দিন থাকবে না—তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙে গিয়ে গণসাধারণের মধ্যেই মিশে যাবে। তখন দেশে দেখা' দেবে দুটো সম্প্রদায়, যাদের আছে, আর যাদের নেই—এই দুই দলে সেদিন বাধবে প্রচণ্ড সংঘর্ষ, মাঝখানকার এই স্তরটি বজায় থাকতে যা এখনো সম্ভবপর হচ্ছে না। এই সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ জীবনে যেদিন আসবে, সেই দিনই সত্যিকার গণসাহিত্য লেখা হবে—এবং তা লিখবে গণসাধারণই।

আজকে নকল গণসাহিত্যের নামে যে হট্টগোল হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তার অনেকটুকুই আল—জীবন থেকে উৎসারিত নয় বলেই তা জ্যান্ত হতে পারছে না, যা পেরেছে রাশিয়ায়।

থতমতভাবে কৃষ্ণা বল্‌লে, 'না সে আমি পারবো না।'

'Don't be silly—সোজা গিয়ে তিন নম্বরের ঘরে ঢুক্‌বে। সাবধান, আমি যাবার আগে আলো জেলোনা—আমি আস্‌চি এখুনি।' জয়ন্ত একরকম জোর ক'রে কৃষ্ণাকে সিঁড়ির ওপর ঠেলে দিলে।

'আমি পার্‌বো না,' কৃষ্ণা আবার মাঝপথে গিয়ে দাঁড়ালো।

'আর ছেলেমানুষি নয় কৃষ্ণা'—জয়ন্ত নীচের লাইব্রেরী ঘরে এসে ঢুক্‌লো।

কৃষ্ণা কোনরকমে সিঁড়ি পার হ'য়ে ঘরে এলো। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন তার বন্ধ হ'য়ে গেছে। এখুনি কেউ যদি এসে পড়ে! অন্ধকারে অবিশ্যি তাকে দেখ্‌তে পাবে না।—যদি আলো জ্বালে? যদি চোর মনে ক'রে একটা হৈ-চৈ কাণ্ড বাধায়!

'ওকি কর্‌ছো? আলোটা জ্বালো!' অস্ফুট কণ্ঠে কৃষ্ণা বল্‌লে।

'আলো জ্বাল্‌তে আমার ভয় করে।' কৃষ্ণাকে আরও কাছে টেনে জয়ন্ত বল্‌লে।

সুইচটা টেনে দিয়ে কৃষ্ণা সরে' দাঁড়ালো।

জয়ন্ত অপ্রস্তুত ভাবে বল্‌লে, 'তুমি বলো ত আমি নীচে যেতে পারি। লাইব্রেরী-ঘরে একটা সোফা আছে।'

'হ্যাঁ তাই যাও।' কৃষ্ণার সমস্ত শরীর তখনও কাঁপছিল—জয়ন্ত চলে' যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

মিসেস দে'র অসুস্থ চোখে নিদ্রাহীনতার চিহ্ন—কাল রাতে একটুও তাঁর ঘুম হয়নি—এরকম যে একটা কিছু হবে তা তিনি আগেই জান্‌তেন, অথচ পার্টিতে যাবার উৎসাহ তাঁর কোনদিন কম্‌বে বলে মনে হয় না। কী ক্লান্তিকর অসুস্থ আবহাওয়া! তবু মিসেস দে'র এই ভাল লাগে—বন্ধুদের হৃদয় যে তিনি কতখানি অধিকার করে আছেন সকলে যখন বিগলিত ভাবে সেটা নিবেদন করে, এমন কি তার বাড়ীর লুসি কুকুরটার কুশল প্রশ্নও যখন বাদ যায় না—মিসেস দে তখন বেশ কৌতুক অনুভব করেন। কিন্তু আজ তিনি ক্লান্ত—সমস্ত পথ তিনি ড্রাইভারকে বকেছেন—আগে গাড়ী পাঠান হয় নি বলে'।

বেবির সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত কিন্তু জয়ন্তকে নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

মিসেস দে'র ধারণা, জয়ন্ত তাঁর শাসন মেনে চলে—তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন কিছুই তার ঠিক থাক্‌বে না। হয়ত গাড়ী নিয়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরেই কোথায় এলোমেলো ঘুরে বেড়াবে! কিম্বা সিনেমা দেখেই রাত্রের অর্দ্ধেক কাটিয়ে দেবে—তার ঠিক কি!

তিনি না থাক্‌লে বাড়ীতে শৃঙ্খলা থাকে না, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মিঃ দে একথা বার বার উচ্চারণ করেন।

দোকান থেকে আজ স্যুটগুলো দিয়ে যাবার কথা, কেই বা মিলিয়ে দেখেছে—হয়ত দু' একটা জিনিষ না দিয়েই বিলে সই করিয়ে নিয়ে গেছে। কারখানা থেকে মটর সাইকেলখানাও হয়ত আনা হয় নি। এই জন্যেই কোথাও গিয়ে তাঁর শান্তি নেই অথচ পার্টির কথা শুন্‌লে বিশ বছর আগেকার মত এখনও তাঁর দেহ যেন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

কতদিনের কত সব কথা মনে পড়ে—

বিশ বছর আগেকার কয়েকটি মুহূর্ত্ত চোখের সাম্‌নে সোনালি বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। রাস্তার হট্টগোলে মিসেস দে'র তন্দ্রা কেটে গেল। গেটের আলো তখনও জল্‌চে, তিনি না বলে' দিলে কারও সে দিকে হুঁস আছে বলে' মনে হয় না—অথচ তাঁর কী!

এতগুলো স্থূল মস্তিষ্কের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে সজাগ করে' দিতে তিনি বেঁচে আছেন নাকি!

মিসেস দে দুর্ব্বল চোখে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। কত কথা তাঁর মনের অনাচে কানাচে উঁকি মার্‌ছে—কত বছর আগেকার স্বপ্ন আবার তাকে ঘুমের মধ্যে নাড়া দিয়ে গেছে। মিসেস দে অন্য মনস্কভাবে উঠে এলেন।

ছাদের এদিকে সারি সারি ফুলের টব সাজানো—অযত্নে-অবহেলায় আবর্জ্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। অথচ এরা একদিন যে সৌখিন হাতের পরিচর্য্যা এবং প্রশ্রয় পেয়ে বেড়ে উঠেছে—সে হাত এখন কত দুর্ব্বল আর অসহায়। মিসেস দে'র অজ্ঞাতে একটা দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ভোর হ'তে এখনও অনেক বাকী—শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে তাঁর বেশ ঘুম আস্‌ছে বিছানায় আশ্রয় নিলে এখন হয়ত তিনি অনেকক্ষণ ঘুমুতে পারেন—কিন্তু নিরুপায়। এখুনি দারোয়ান গেটের চাবি চাইবে—সোফার গাড়ী বের কর্‌বে—সরকার ষ্টোররুমে এসে ষ্টক্ মেলাতে বস্‌বে—অবসর নেই তাঁর, মিসেস দে আবার উঠে দাঁড়ালেন।

জয়ন্ত একটু বেলা করে ওঠে—অত বেলায় কোন ছেলেরই ওঠা উচিত নয়—বিশেষ ক'রে এবার তার পরীক্ষার বছর। কিন্তু না ডাক্‌লে যে তার ঘুম ভাঙ্‌বে এমন আশা করা যায় না। মিসেস দে দরজার সাম্‌নে এসে বার দুই টোকা দিলেন—অল্প আঘাতেই দরজা খুলে গেল, আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

জানালা খুলে দিতেই একটু আলো ঘরে এলো—মিসেস দে বিছানার পাশে এসে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে মনে হ'লো—মিসেস দে মনে মনে ভাবলেন, তাঁরও ভুল হওয়াটা সম্ভব—সত্যি জয়ন্তের এদিকটা তিনি কোনদিনই ভেবে দেখেন নি।

ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

ইংল্যাণ্ডে নতুন মন্ত্রিসভা

আমরা পূর্ব্বেই বলেছিলাম, বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির অনুকূলে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্যভাবে আবশ্যক। কিছু বিলম্বে অবশ্য এ-কথা সত্যে পরিণত হ'ল।

নরওয়ে অভিযানের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের পদত্যাগে তাঁর যুদ্ধনীতির অসাফল্যই স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মিঃ উইনষ্টন চার্চিল নতুন প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হ'য়েছেন।

মিঃ চার্চিলকে আমরা বরাবরই স্পষ্টভাষী এবং তেজস্বী বক্তা রূপে লক্ষ্য করে' এসেছি। বর্ত্তমান যুদ্ধের এই জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর যোগ্যতার পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল।

ভারতবাসীর দিক থেকেও বৃটিশ মন্ত্রীসভার এই পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। লর্ড জেটল্যাণ্ডের স্থানে মিঃ এল, এস, এমারী ভারতসচিবের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। আমরা লর্ড জেটল্যাণ্ডের কাছে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার কিছু সমাধান আশা কোরেছিলাম। কিন্তু নির্ভেজাল নৈরাশ্য ছাড়া তাঁর নিকট থেকে আর কিছুই পাইনি। এ-অবস্থায় নতুন ভারতসচিব মিঃ এমারী বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে' ভারতবাসীর ন্যায্য দাবী সম্পর্কে আন্তরিকভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন, এ-আশা করা যেতে পারে।

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম

জার্মানী কয়েকদিন পূর্বে একই সময়ে ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমন কোরেছিলো। গত সপ্তাহে তা'রা একই সময়ে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ আক্রমন কোরেছে। ডেনমার্ক এখন সম্পূর্ণরূপে জার্মান শাসনাধীন। নরওয়ের বিস্তৃত ভূভাগেও তা'রা নীতিমতো আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কোরেছে।

বৃটিশ এবং ফরাসীবাহিনী নরউইজান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু তার ফলাফল জানতে কারও আর বাকা নেই। মিত্রবাহিনী নরওয়ে অভিযানে যে আদৌ কৃতকার্য হ'তে পারেনি, বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রীসভার পতনে তা' সুপ্রমাণিত হয়েছে।

কয়েকদিন আগেও সারা পৃথিবীর দৃষ্টি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের উপর কেন্দ্রীভূত ছিলো। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ড আত্মসমর্পন করেছে—জার্মানরা রাণী উইলহেলমিনাকে বন্দী করে' নিয়ে যাবার কৌশল কোরেছিলো, কিন্তু সে-কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। রাণী উইলহেলমিনা তাঁর কন্যা, জামাতা এবং দৌহিত্রীদের নিয়ে হল্যাণ্ড ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

এখন বেলজিয়াম ও ফরাসী এলাকায় জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমন চলেছে। বেলজিয়ামের রাজধানী অষ্টেণ্ডে স্থানান্তরিত হয়েছে—রাজা লিওপোল্ড তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে থেকে বীরের ন্যায় শত্রুর গতি-

রোধের জন্য এখনও যুদ্ধ পরিচালনা কোরছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁর পিতা বেলজিয়ামের ভূতপূর্ব রাজা এলবার্টও এইভাবে যুদ্ধ কোরে ইতিহাসে এক কীর্তিউজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি কোরেছিলেন।

য়ুরোপবাসীর আতঙ্ক

চরম সঙ্কট-সংশয়ে য়ুরোপীয় গভর্ণমেণ্টগুলি এবং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ নিরাপদে রাখবার অথবা গোপনে লগ্নী কোরবার অভিপ্রায়ে যুক্তরাষ্ট্রে পঁচিশ কোটি পাউণ্ড পাঠিয়েছেন। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড ও বাণিজ্য-বিভাগ থেকে কয়েকদিন আগে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সরকারী কর্মচারিগণ জানতে পেরেছেন যে, যা'তে এই অর্থের কোনোরকম হদিস্ না পাওয়া যায়, এজন্য আমেরিকাবাসিগণ তাদের য়ুরোপীয়ান বন্ধুবান্ধবগণের প্রচুর অর্থ নিজেদের নামে লগ্নী কোরছেন। উপরোক্ত পঁচিশ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে বেশির ভাগই কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারে লগ্নী করা হয়েছে। এছাড়া আরও বহু অর্থ সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত এবং মাটির নিচে পুতে রাখা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থের প্রকৃত মালিকের সন্ধান করা দুঃসাধ্য। ওয়াশিংটনের সরকারী কর্মচারিগণের বিশ্বাস, অধিকাংশ অর্থই এসেছে জার্মানী, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড থেকে। বৃটেন ও ফ্রান্স থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ নাকি কম।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি

গত কয়েক সপ্তাহ যাবত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে বোম্বেতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির একটি অধিবেশন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে যে-সব সাবকমিটি রিপোর্ট দাখিল কোরেছেন, কমিটি সেই সব রিপোর্ট আলোচনা কোরে স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত ব্যক্ত কোরেছেন। আগামী একুশে জুন কমিটির পুনরায় অধিবেশন হবে।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন কার্যে যে-সকল মূলনীতি অবলম্বনের অনুকূলে কমিটি অভিমত প্রকাশ কোরেছেন তা' আলোচনা কোরে এই ধারণা কোরতে পারি যে, কমিটি সম্প্রতি ভারতের বাস্তব অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেই পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। আদর্শের দাবীর সঙ্গে বাস্তব-অবস্থার সামঞ্জস্য-বিধান খুবই কঠিন কাজ—এই সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভব হ'লেই যে-কোনো পরিকল্পনা কিছু কার্যকারী হ'তে পারে। অবশ্য, রাষ্ট্রীয়শক্তি নিজেদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারতে সামরিক শিক্ষা

বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতে সামরিক শিক্ষাদান সম্পর্কে ধীরে-ধীরে উদারভাব অবলম্বন কোরছেন বলে' মনে হয়। যুদ্ধারম্ভের পর দু'টি নতুন সামরিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কাজ চল্‌ছে। ভারতীয় সেনাদলে পঁচিশ হাজার লোক গ্রহণের পরিকল্পনা অনুসারে যে-কাজ আরম্ভ হয় তা-ও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। অবশ্য এই ব্যবস্থা স্থায়ী হবে কিনা বলা কঠিন, তবে আপাতত যে বহু বেকার ভারতবাসীর কিছু পরিমাণ জীবিকার সংস্থান হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এ-কথাও নিঃসংশয়ে সত্য যে, সামরিক কাজে নিয়োগলাভের যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়ের আজ

আর অভাব নেই। ভারতের সকল প্রদেশেই যে সামরিক শিক্ষা ও সামরিক বৃত্তিলাভের উপযুক্ত প্রচুর লোক আছে, এই যুদ্ধের সময় ভারত গভর্ণমেণ্ট তা' পরীক্ষা করে' দেখতে পারেন।

ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট

বাঙ্‌লা গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস্ ফ্লাউড-এর সভাপতিত্বে যে ভূমিরাজস্ব কমিশন নিয়োগ করেন সম্প্রতি তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

কমিশনের অধিকাংশ সভ্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (জমিদারী প্রথা) করার যে চুক্তিই ছিল না কেন, বর্তমানে বহু কারণে তা' আর উপযোগী নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (জমিদারী প্রথা) উঠিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে এমন কোনো ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত যাতে চাষী প্রত্যক্ষভাবে গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসে। এবং এই চাষীকে প্রত্যক্ষভাবে গভর্ণমেণ্টের অধীনে আনার জন্য তাঁরা গভর্ণমেণ্টকে বাঙ্‌লার সমস্ত জমিদারী ও মধ্যস্বত্বভোগীর সমস্ত স্বত্ব কিনে নিতে বলেছেন। অধিকাংশ সভ্য মনে করেন যে, জমিদারী ও অন্যান্য সব মধ্য স্বত্ব কিনে নিলে জমিদার, তালুকদার ও জোতদার প্রভৃতিকে জমিদারীর বা তালুকের নীট্ আয়ের দশগুণ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ বারোগুণ আবার কেউ পনেরোগুণও প্রস্তাব কোরেছেন। ওয়াকফ্, দেবোত্তর ও অন্যান্য ট্রাষ্ট সম্পত্তির বেলায় নীট্ আয়ের পঁচিশগুণ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে অধিকাংশ সভ্য সুপারিশ কোরেছেন। রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙ্‌লার জমিদারীগুলির নীট্ আয় ৭'৭৯ কোটি টাকা। সুতরাং দশগুণ টাকা খরচ দিতে হ'লে গভর্ণমেণ্টকে ৭৭'৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। জমিদারীগুলির নীট্ আয় ৭'৭৯ কোটি টাকার উপর নির্ভর কোরে এই ৭৭'৯ কোটি টাকার ঋণ তুলবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়েছেন।

কমিশনের এই সুপারিশ অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট জমিদারী ইত্যাদি কিনে নিলে সে-সবের পরিচালনা বাবদ ১'৮২ কোটি টাকা, খাজনা রেহাই ও অনাদায়ী খাজনা ইত্যাদিতে ১'৩০ কোটি টাকা যাবে বলে' অনুমান করা হয়েছে। এবং এই হিসেবে গভর্ণমেণ্টের লাভ হবে ২'২৩ কোটি। অবশ্য কমিশনের সভ্যগণ বলেছেন যে গভর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হবে শুধু এই দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা জমিদারী ইত্যাদি কিনবার সুপারিশ করেন নি, কিনলে চাষীদের অন্যান্য যে সুবিধে হবে তাই দেখেই তাঁরা সুপারিশ কোরেছেন।

গভর্ণমেণ্ট যদি সুপারিশ মতো জমিদারী ইত্যাদি কিনবার সাব্যস্ত করেন তাহ'লে বাংলার মুমূর্ষু চাষীরা উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে বিশেষ কোরে কি সুখ-সুবিধা লাভ কোরবে তার কোনও উল্লেখ বা আভাষ কমিশনে নেই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ-সাধনের মামুলী পরিকল্পনা ছাড়া এই বিশেষ কমিশন কোনো নতুন পথ নির্দেশ দিতে পারেন নি, বলা যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সংস্কার

এ-যাবত কর্পোরেশনের হিতৈষী কাউন্সিলরদের মুখ থেকে হা-হুতাশ শুনে আসছি যে, কর্পোরেশনের আর্থিক-অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হচ্ছে, প্রতি বছর তহবিলে ঘাট্‌তি পড়ছে এবং রিজার্ভ

ফাণ্ড-ও ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে আসছে। মোটের উপর, কোনো দিক দিয়েই আর্থিক-ব্যাপারে স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ-অবস্থায়—একদিকে ব্যয়-সঙ্কোচ ও অন্যদিকে আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যে আশু প্রয়োজন, এরূপ পরামর্শ দিতে উপরোক্ত বিচক্ষণেরা ত্রুটি করেন নি।

এইরূপ পরিস্থিতিতে, দায়িত্বসম্পন্ন কয়েকজন কাউন্সিলর সিদ্ধান্ত কোরলেন যে, মোটা-মাইনের কর্ম্মচারীদের গ্রেড্, বেতন ও ভাতা ইত্যাদি বাড়িয়ে দিতে হবে এবং চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার এবং চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চতন কর্ম্মচারীর কার্যকালের মেয়াদও বেশ কিছুদিনের জন্য বৃদ্ধি কোরতে হবে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে পুরানো কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হ'য়ে আসার দু' একদিন পূর্বেই এই সব দয়ার্দ্র চিত্ত রাতারাতি কয়েকটা সভার আয়োজন করে' তাঁদের সাধু সংকল্প কার্যে পরিণত কোরে ফেললেন। এইভাবে কর্পোরেশনের আর্থিক-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হ'তে দিয়ে কলিকাতার করদাতাগণ ও জনসাধারণ নিষ্প্রতিবাদে আরো একবার নিশ্চিন্ত হ'তে চলেছিলেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, এবার এই নিষ্প্রতিবাদ নিশ্চিন্ততার আয়োজন আর কার্যে পরিণত হ'ল না। এবারকার নবগঠিত কর্পোরেশনের অধিকাংশ কাউন্সিলর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে উপরোক্ত অরাজকতার প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। গত তিরিশে এপ্রিল তাঁদের উদ্যোগ্যে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, গত ১৯৩৯—৪০ সালে কর্পোরেশনের কর্মচারীদের গ্রেড্, বেতন, ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে' যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে (যা' এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নি) কর্পোরেশনের আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করে' ব্যয় সঙ্কোচ করবার জন্য তা নাকচ করা হ'ল।...আর একটি প্রস্তাবে, চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, প্রথম ও দ্বিতীয় ডেপুটি এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার এবং সেক্রেটারীর কার্যকালের মেয়াদ, গ্রেড্ প্রভৃতি অনাবশ্যক রূপে বৃদ্ধি করে' গত মার্চ মাসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ১৪ই মে কর্পোরেশনের আর একটি অধিবেশনে তা নাকচ করা হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু মহাসভার দলভুক্ত কাউন্সিলররা তাঁদের সদ্যোজাত দেশ-হিতৈষিণার নৈতিক-দায়িত্বে বসুদলের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ কোরেছিলেন! জনসাধারণ ও করদাতাগণের হয়তো স্মরণ আছে যে, প্রধান কর্মকর্তার কার্যকাল তৃতীয় বারের জন্য যখন বৃদ্ধি করা হয় তখন এই সর্তে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ চতুর্থবার আর বৃদ্ধি করা হবে না।

আসল কথা হচ্ছে, স্বার্থ। এই স্বার্থসিদ্ধির তাড়নায় কাউন্সিলররা একদিকে যেমন নির্বাচিত হওয়ার পরদিনই করদাতাগণকে ভুলে যান্, অন্যদিকে তেম্‌নি দলাদলির অস্বাস্থ্যকর উৎসাহে কোনো সাধু উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কলঙ্ক-অভিযান কোরতে লজ্জাবোধ করেন না। আর সুবিধে এই, করদাতাগণ ও জনসাধারণ কোনোদিনই কৈফিয়ৎ দাবীর ভাষা শেখেনি। সুতরাং কর্পোরেশনে সংস্কারের প্রচেষ্টায় বসু-দল যে এইশ্রেণীর কাউন্সিলরদের নিকট থেকে আন্তরিক সহযোগিতার পরিবর্তে কর্দম-পুরস্কার পাবেন তা'তে আর বিচিত্র কী!

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী

১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭১।১, পটুয়াটোলা লেনের 'ইণ্ডর প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়